৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০৬

টপিক: বিশ্বের প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক-১: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য বৃহৎ শক্তির বৈদেশিক সম্পর্ক (রাশিয়া, চীন), ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো-বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)
বিশ্বের প্রধান শক্তিসমূহের মধ্যে বৈদেশিক সম্পর্ক-২: চীনের পররাষ্ট্রনীতি (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে), নিউ সিল্ক রোড নীতি, ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি, মুক্তার মালা নীতি এবং অন্যান্য (যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সাথে প্রতিযোগিতার প্রেক্ষাপটে)

9:20

Jalal Md. Ashfaq
DRMC
BUTEX
Admin (66)

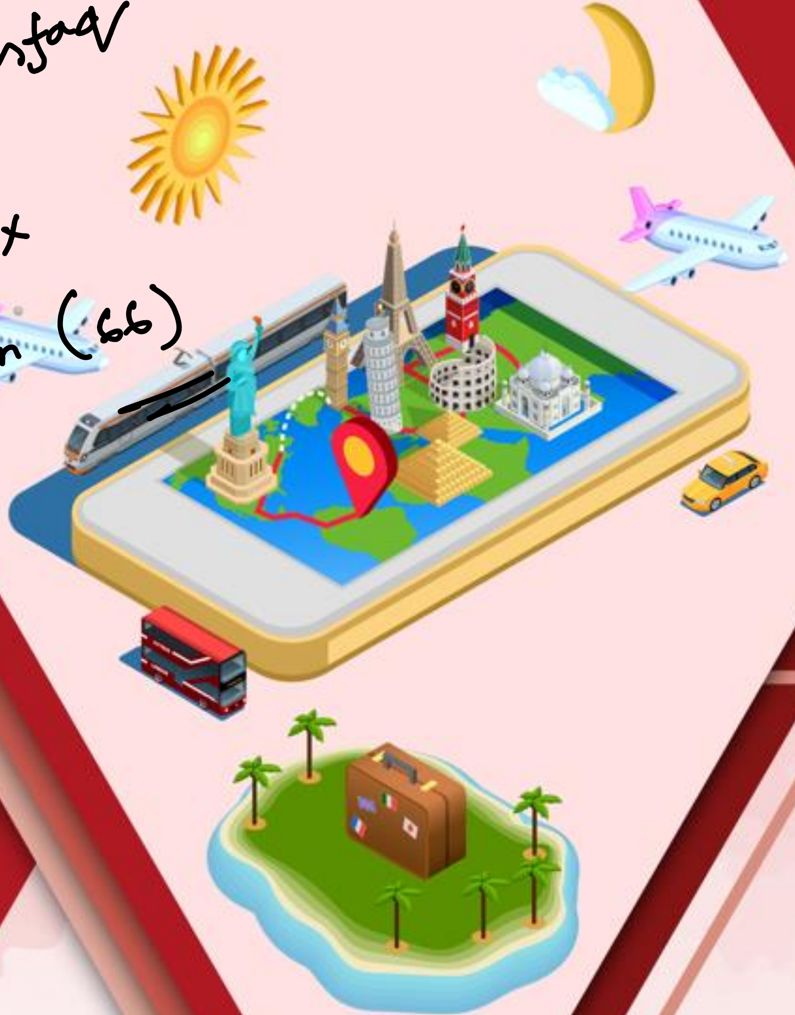

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
উদ্যম-উন্মেষ

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

✓ **সামরিক ক্ষমতা প্রদর্শন:** যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখে প্রধানত ‘Power Politics’ বা ক্ষমতার রাজনীতির মাধ্যমে। আর এই ক্ষমতা দেখানোর মূল উপাদান হলো সামরিক শক্তি। সামরিক খাতে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দের তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র সবসময়েই প্রথম স্থান দখল করে থাকে। The Stocholm International Peace Research Institute (SIPRI) এর এক গবেষণায় উঠে এসেছে পৃথিবীর মোট সামরিক খাতে খরচের প্রায় ৩৯% করে যুক্তরাষ্ট্র। এই বিপুল সামরিক শক্তি শত্রু ও দুর্বৃত্ত রাষ্ট্রসমূহ, যারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকিস্বরূপ, বিশেষত যাদের বিধ্বংসী অস্ত্রের কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তাহীনতা অনুভব করে, তাদের নিরস্ত্র করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধ নিবারণ করে আবার যেখানে নিবারণ ব্যর্থ হয় সেখানে যুদ্ধের মাধ্যমে মার্কিন স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করে। ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসাইনের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুদের অভিযোগ তুলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও শান্তির কথা বলে যুক্তরাষ্ট্র ইরাকে সামরিক হামলা করে। কিন্তু পরবর্তী তদন্তে আর সেরকম কোনো অস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এছাড়া লিবিয়া, সিরিয়া, ইয়েমেন, আফগানিস্তানের মতো দেশগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্র তার সামরিক শক্তির মহড়া দেখিয়ে বিশ্বমঞ্চে তাদের স্বার্থের বাইরে কেউ গিয়ে শান্তিতে থাকতে পারবে না- এই বার্তাই দিয়ে আসছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

- ✓ **অস্ত্র ব্যবসার নিয়ন্ত্রণ:** মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে আরেকটি বড় নিয়ামক তাদের বিশাল আকৃতির অস্ত্র বাণিজ্য। SIPRI এর প্রকাশিত আরেকটি প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বের অস্ত্রের বাজারে ২০১৬ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি অস্ত্র সরবরাহ করেছে যুক্তরাষ্ট্র; যা বিশ্বের সরবরাহকৃত অস্ত্রের ৩৭& । প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের বিশাল অস্ত্রের বাজারে নিজেদের প্রাধান্য ধরে রাখতে যা করা প্রয়োজন, সে অনুযায়ীই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি গৃহীত হয়। ভারত, সৌদি আরবের মতো দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদিত অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা; অস্ত্রের বাজার চাঙ্গা রাখতে মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়ার মতো অঞ্চলগুলোতে সংঘাত বা যুদ্ধংদেহি অবস্থা বজায় থাকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য লাভজনক।
- ✓ **বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ:** নয়া বিশ্ব ব্যবস্থায় উন্নত দেশগুলোর উপর অনুন্নত দেশগুলোর নির্ভরশীলতা বিদ্যমান আর উন্নতবিশ্বের শীর্ষে অবস্থান করে বর্তমানে একক পরাশক্তির ভূমিকায় আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যনীতিকে নিজেদের অনুকূলে রাখার ব্যাপারে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের হ্যাম্পশায়ারে ব্রেটন উডস সম্মেলনে ২টি সংস্থা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সংস্থাগুলো হলো IBRD ও IMF. সংস্থাগুলো উন্নয়নশীল তথা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশ্ব অর্থনীতি ও বাণিজ্য ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাই যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

- ✓ **তৃতীয় বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ:** পশ্চিমা উন্নত দেশগুলো, বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থার বক্তব্য অনুযায়ী তারা মানবিক কারণেই তৃতীয় বিশ্বকে সাহায্য করে থাকে, কিন্তু বাস্তবে এর পিছনে উন্নত বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণমূলক উদ্দেশ্যই বেশি কাজ করে। স্বল্পোন্নত, ক্ষুদ্র ও দুর্বল দেশগুলোর জাতীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা বাণিজ্য প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ সংস্থাগুলোকে ব্যবহার করে থাকে। এই সকল রাষ্ট্রের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অনুদান ও ঋণ প্রদানের সময় এই সংস্থাগুলো নানা রকম শর্ত ও বিধি নিষেধ আরোপ করে। এই সকল শর্তের বেড়াজালে পড়ে ঐ দেশগুলো পরোক্ষভাবে পশ্চিমা বিশ্ব তথা যুক্তরাষ্ট্রের নতুন উপনিবেশে পরিণত হয়প্ল এছাড়াও কখনো কোনো রাষ্ট্র অবাধ্যতা প্রদর্শন করলে বা কোনোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি হয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র সেই দেশের উপর অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক অবরোধ আরোপ করে সেই দেশকে কোণঠাসা করে ফেলে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

✓ **কূটনৈতিক কলা-কৌশল:** পরাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থানকে ধরে রাখার জন্য নানা কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে আসছে। এক্ষেত্রে তারা সময়ে সময়ে তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণে দ্বিধাবোধ করে নাপ্ন উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে তুমুল স্নায়ুযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় চার দশকের বেশি সময় জুড়ে লিপ্ত ছিল, সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে রাশিয়ায় পরিণত হলে তাদের সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়প্ন ফলে চেচনিয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে যুক্তরাষ্ট্র কোনো প্রতিক্রিয়া দেখায়নিপ্ন আবার ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সংকট নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘসময় ধরে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেছিল, এমনকি এই দুই দেশের মাঝে শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতার আমন্ত্রণেও তারা নিস্পৃহ ছিলপ্ন উদ্দেশ্য ছিল ভারত পাকিস্তান দুই দেশের সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখাপ্ন কিন্তু পরবর্তী সময়ে চীন পরাশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে এই অঞ্চলে প্রাধান্য দিতে শুরু করেপ্ন দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রভাব প্রশমনে ভারতের ভূমিকার তাৎপর্য লক্ষ্য করে মার্কিন প্রশাসন ভারতের সাথে এখন সুসম্পর্ক গড়ে তুলছে।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

✓ **বিভিন্ন জোট গঠন:** পরিবর্তনশীল কূটনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিভিন্ন সামরিক ও আঞ্চলিক জোটসমূহ। যেমন তারা ইউরোপের মিত্র রাষ্ট্রদের নিয়ে NATO গঠন করে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, ইতালি, কানাডা, ডেনমার্ক, লুক্সেমবার্গ, নরওয়ে, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড ইত্যাদি রাষ্ট্রকে সাথে নিয়ে গঠিত এই সামরিক জোটের সাহায্যে একক পরাশক্তি হিসাবে আধিপত্য বিস্তারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশি তৎপরতা বৃদ্ধি পায় বহুগুণ। NATO-এর অন্তর্ভুক্ত সৈন্য প্রেরণ করে বসনিয়া হারজেগোভিনা, কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা, আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, এল সালভাদর প্রভৃতি দেশে নানা অজুহাতে যুক্তরাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করেছে। NATO-এর মতো, SEATO, CENTO প্রভৃতি সামরিক জোটকে ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করে। এছাড়াও জাতিসংঘ ও তার সকল অঙ্গ সংগঠনগুলো ও অন্য সহযোগী বৈশ্বিক সংস্থাগুলোতে শীর্ষ অনুদানকারী দেশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র প্রায়ই নিজেদের স্বার্থে এসব সংস্থার মাধ্যমে অন্যান্য রাষ্ট্রের উপর নিজেদের পররাষ্ট্রনীতির অনুকূলে প্রভাব খাটায়।

মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামক

✓ **মিডিয়ার নিয়ন্ত্রণ:** যুক্তরাষ্ট্রের মালিকানাধীন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম যেমন NBC, Fox News, Wall Street Journal, New York Post, ABC, CNN, CBS প্রভৃতি নিউজ মিডিয়াগুলো প্রতিনিয়তই মার্কিন পরাশক্তির পক্ষ হয়ে কাজ করে যাচ্ছে এবং এইসব মিডিয়ার সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র পূর্বের উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের স্বর্ণযুগের চেয়েও অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করতে পারছে সারা দুনিয়ায়। এসব মিডিয়ার বদৌলতেই নিজেদের সুবিধামত বিশ্বজনমত নিজেদের দিকে টেনে নেয় এবং অন্য দেশের উপর অন্যায় সামরিক আগ্রাসন বা এক তরফা যুদ্ধ ঘোষণার মতো কর্মকাণ্ডগুলোর বৈধতা দান করেপ্ম উপরন্তু চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, সঙ্গীত ইত্যাদি বিনোদন মাধ্যমগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্রের জয়জয়কার সর্বত্রপ্ম এসব সাংস্কৃতিক উপকরণের মাধ্যমেও যুক্তরাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় দর্শন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ও পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়ে দিতে সমর্থ হয়। যুক্তরাষ্ট্রই বিভিন্ন সংকটে পৃথিবীর ত্রাণকর্তা- এধরনের একটা ধারণা মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করে দিতে চেষ্টা করে এসকল বিনোদনের মাধ্যমপ্ম

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

এখানে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ আলোচনা করা হলো।

- **ভূ-রাজনৈতিক পদক্ষেপ:** চীনের ক্রমবর্ধমান ভূরাজনৈতিক প্রভাব রুখতে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো- চীনের চারপাশ ঘিরে যে রাষ্ট্রগুলো আছে, সেগুলোকে আরো শক্তিশালী করা কিংবা আমেরিকার প্রভাবে আনা। আর এ দুইটির কোনোটিই কাজ না করলে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে অস্থিতিশীল রাখা যেন তাদেরকে দিয়ে চারপাশ থেকে চীনকে অবরুদ্ধ করে রাখা যায়প্ম এতে করে চীন নিজের সীমানার বাইরে প্রভাব বিস্তারের কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ পাবে না এবং নিজেকে নিজের সীমানার মাঝেই আবদ্ধ রাখবেপ্ম উত্তর দিকে চীনকে নিয়ন্ত্রণের জন্য রাশিয়া রয়েছে, পূর্বদিকে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ জাপান, তাইওয়ান এবং দক্ষিণ কোরিয়াপ্ম দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে মার্কিন নিয়ন্ত্রণাধীন ইন্দোচীন, ফিলিপাইন এবং ইন্দোনেশিয়াপ্ম পশ্চিমদিকে (যেটাকে সচরাচর 'চীনের পিছনের দরজা' বলে অভিহিত করা হয়) রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানপ্ম যুক্তরাষ্ট্রের 'এশিয়ান ন্যাটো' তৈরি করার যে পরিকল্পনা নিয়ে কথা চলছে, তাতে উজবেকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের পাশাপাশি কাজাখস্তান ও আজারবাইজানকে অন্তর্ভুক্ত করা হবেপ্ম চীনের চতুর্দিকের দেশগুলোকে আমেরিকা বল প্রয়োগের মাধ্যমে চীনের দিকে সর্বদা কঠোর দৃষ্টি রাখতে বাধ্য করছেপ্ম

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

❖ **অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নীতি:** রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, জাপানকে হটিয়ে চীন এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বড় অর্থনীতিসমৃদ্ধ দেশ। এই অর্থনীতি এখন যুক্তরাষ্ট্রকে, বিশ্ব অর্থনীতি তথা রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। তাই চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক সম্ভাবনা পর্যবেক্ষণ এবং Strategic Partnership অব্যাহত রাখার নীতি গ্রহণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। কারণ চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শগত দ্বন্দ্ব থাকলেও চীনের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক অংশীদারও যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে মোট বিনিয়োগের প্রায় ৩০% বিনিয়োগ করেছে চীনে। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে প্রায় ৪৩৫ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও সেবা আমদানি করেছে এবং রপ্তানি করেছে প্রায় ১২৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য ও সেবা। সামনে চীনের কাছে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া তিন হাজার ৭০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে ৩০০টি বোয়িং বিমানও চীনের কাছে বিক্রি করা হবে। এটা পরিষ্কার যে, চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে যুক্তরাষ্ট্র ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত চীনের বিরুদ্ধে যে বাণিজ্য যুদ্ধ শুরু করেছিল, তাকে ছাপিয়ে উভয় দেশই পরস্পরের মাধ্যমে লাভবান হবার চেষ্টাকেই বেশি প্রাধান্য দিবে।

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

❖ **দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে ব্যবহার:** চীনের সঙ্গে ভারতের দ্বন্দ্বকে কাজে লাগিয়ে মহাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে চীনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ এশিয়ার উঠতি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র ভারতকে ব্যবহার করতে চাইছে যুক্তরাষ্ট্র। অনেক দিন থেকেই তারা চীনের বিরুদ্ধে প্রক্সি বাহিনী হিসেবে ভারতকে সহযোগিতা করার পরিকল্পনা করছে। নিজে সরাসরি জড়িত না হয়ে তৃতীয় কোনো পক্ষ দিয়ে শত্রুকে ঘায়েল করাটা যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো কৌশল। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন চীন-ভারতের সংঘাতের সময় যুক্তরাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকলেও এখন স্পষ্টভাবেই তারা ভারতের দিকে ঝুঁকছে। ভারতে সাম্প্রতিক মার্কিন প্রেসিডেন্টের সফর এবং বিশাল আকারের অস্ত্র বাণিজ্য চুক্তি সেদিকেই ইঙ্গিত দেয়। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে চীন বর্তমানে পাকিস্তানের পক্ষ নিচ্ছে, মিয়ানমারের সাথেও তাদের রয়েছে গভীর সম্পর্ক। সে ক্ষেত্রে ভারত তার দ্বিপাক্ষিক ইস্যুগুলোতেও যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সমর্থন পাবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্র মিয়ানমারকে চাপে ফেলতে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তা সরকারের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে। পাকিস্তানকেও চীনের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত করতে তাদের উপর নানাবিধ চাপ প্রয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহায়তা বন্ধের হুমকি প্রদান করছে।

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

- **সামরিক নীতি:** ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় চীনের সামরিক শক্তির উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং চীন সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক নীতি কী হতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করে। সেই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র চীনের সাথে একটা স্বচ্ছ ও পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায় যেন ভুল বুঝাবুঝি দূর হয় এবং ঝুঁকি হ্রাস পায়। তবে তাইওয়ানে চীনের যে কোনো ধরনের সামরিক আগ্রাসন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিহত করবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূ-খণ্ডে আঘাত হানার মতো কোনো ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করলে যুক্তরাষ্ট্রও পাল্টা ব্যবস্থা নিবে। এছাড়াও ইন্দো-চীন অঞ্চলে চীনের সামরিক আগ্রাসন প্রতিহত করতেও যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট। চীনের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক খাতে বাজেট প্রায় ৩ গুণ। তবে বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনবল সমৃদ্ধ চীনা সামরিক বাহিনী যেন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো আগ্রাসী হয়ে না উঠে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখছে যুক্তরাষ্ট্র।

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

- **তাইওয়ান সংকট**

.

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

❖ **চীন বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ:** ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেডিলিন অলব্রাইট কর্তৃক “USA, China & India in the 21st Century” শীর্ষক এক ভাষণে চীনের ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ছিলোঃ চীনকে WTO এর অন্তর্ভুক্ত করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কঠিন বিধিমালার ভিতর নিয়ে আসা, চীনের পরমাণু প্রযুক্তি-সমৃদ্ধকরণে নিষেধাজ্ঞা আরোপণের পদক্ষেপ, তাইওয়ান প্রণালির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে সহযোগিতা, তিব্বতের ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং দালাইলামার সাথে সংলাপ শুরু করা, উত্তর কোরিয়ার স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা এছাড়াও চীনের সাথে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চীনা পণ্য ও বিনিয়োগ প্রবেশে কড়াকড়ি আরোপ, বিশ্বের শীর্ষ টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি নির্মাতা চীনা কোম্পানি হুয়াওয়েকে যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা, যুক্তরাষ্ট্র থেকে কলকারখানা চীনে চলে যাওয়া আটকানো, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে অধ্যয়নরত চীনের শিক্ষার্থীদের ভিসার সুযোগ সংকীর্ণ করে দেওয়া, হংকং এর বিক্ষোভে সমর্থন জানানোর মতো চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপসহ ইত্যাদি নানা পদক্ষেপ নিয়ে বিশ্বরাজনীতিতে চীনের প্রভাব কমিয়ে আনতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র।

চীন সম্পর্কিত যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন পদক্ষেপ

স্নায়ুযুদ্ধ চলার সময় যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ব্যবহার করেছিল তখনকার প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। একুশ শতকে এসে স্নায়ুযুদ্ধের নতুন এক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে এশিয়ায়, সোভিয়েত ইউনিয়নের বদলে নতুন পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়া চীন এখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির নিষ্ঠুর মঞ্চে চিরকালীন শত্রু বা বন্ধু বলে কিছু নেই। এক সময়ের প্রবল শত্রু জাপান বা জার্মানি পরবর্তীতে পরম মিত্রে পরিণত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্কের গতিপথ কল্পনা করলে দেখা যাবে, এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধকে ছাপিয়ে ক্রমান্বয়ে কৌশলগত সংঘাত বাড়বে এবং এক পর্যায়ে সেটি সর্বাত্মক শীতল যুদ্ধে রূপ নেবে। এমন প্রেক্ষাপটে দুই দেশই এক সময় এই বিবাদ ও সংঘাত শুধু নিজেদের ক্ষতিই করবে- এটি উপলব্ধি করে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক সম্পর্ক নির্মাণে অগ্রসর হবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করা যায়।

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মাঝে সম্পর্কের পর্যায়

❖ **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সময়কালীন সম্পর্ক:** যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পর্ক স্থাপিত হয় ১৮০৯ সালেপ্ম ১৮৬৩ সালের আমেরিকান গৃহযুদ্ধের সময় রাশিয়া কঠোর নিরপেক্ষতা বজায় রাখেপ্ম উনিশ শতকের শেষের দিকে রাশিয়ায় ইহুদিদের বিরুদ্ধে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত ‘Pogroms’ বা জাতিগত হত্যাকাণ্ডের ফলে রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক শীতল হয়ে যায়প্ম তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির অক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের হয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগ দিতে আপত্তি জানাচ্ছিল কেননা মিত্রপক্ষে রাশিয়া ছিল। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের পতনের পরই যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। রাশিয়াতে ১৯১৮ সালে বলশেভিক আন্দোলনে যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ সামরিক বাহিনী অংশগ্রহণ করে। ১৯২২ সালে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হবার পর তার সাথে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে উঠলেও যুক্তরাষ্ট্র ছিল তাদের স্বীকৃতি দেওয়া সর্বশেষ দেশগুলোর একটিপ্ম যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই দুই দেশ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষের প্রধান ৪ পরাশক্তির ২টি ছিলপ্ম জার্মানিকে পরাজিত করতে তখন পুঁজিবাদি গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন একত্রে যুদ্ধের ময়দানে নেমেছিল এবং হিটলারের নেতৃত্বাধীন নাৎসি বাহিনীকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়েছিলপ্ম

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

❖ **স্নায়ুযুদ্ধকালীন সম্পর্ক:** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কে ফাটল ধরে। সাবেক বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে জার্মানি ও জাপানের পরাজয় এবং ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রচুর ক্ষতি ও ধ্বংস সাধন হওয়ায় নতুন বিশ্বব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই শীর্ষ পরাশক্তিতে পরিণত হয়। সে সময় তাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস শেষ পর্যন্ত ‘স্নায়ুযুদ্ধে’ পরিণত হয়। ইতিহাসবিদরা স্নায়ুযুদ্ধ বা Cold War এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে দুইটি দেশের মাঝে এমন পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন যেখানে যুদ্ধ না হলেও যুদ্ধের জন্য সকল প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং একটি টানটান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। অনেকে একে ‘প্রোপাগান্ডা যুদ্ধ’ বলেও অভিহিত করেন কেননা এসময় দুই দেশ একে অপরকে হেয় করতে এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে নানা মিথ্যা দাবি ও গুজব ছড়াতে থাকে। চল্লিশ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হওয়া এই স্নায়ুযুদ্ধের বীজটা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার মাঝেই নিহিত ছিল কেননা পুঁজিবাদি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রসার একটি হুমকি হয়ে উঠে। যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ যেভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছিল তা নিচে তুলে ধরা হলো –

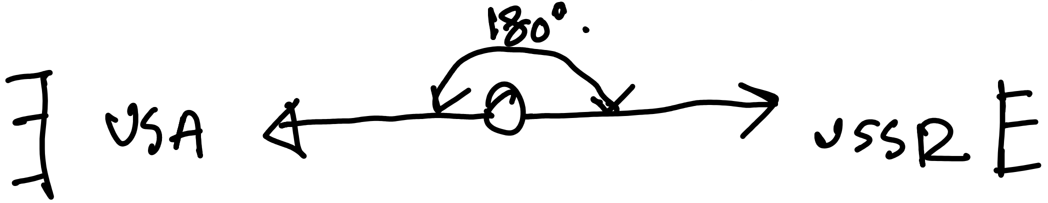

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

- ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট রুশ নেতা জোসেফ স্ট্যালিনকে বাদ দিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল ভবিষ্যত বিশ্ব ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার জন্য আটলান্টিক সনদ (The Atlantic Charter) ঘোষণাবলি বিশ্ববাসীর সামনে উপস্থাপন করেছিলেন তাতে রুশ নেতা রুষ্ট হয়েছিলেন।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমার বিস্ফোরণ এর মধ্য দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে; ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ঔদ্ধত্য রুশ শিবিরকে স্নায়ুযুদ্ধের দিকে আরো ঠেলে দেয়। বিশ্ব অর্থনৈতিক দিক থেকে শক্তিশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক আধিপত্যবাদের বিনাশ সাধনে অগ্রসর হয়। উইনস্টন চার্চিল এর ফালটনের বক্তৃতা ও ১৯৪৭ এর মার্শাল পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে এই চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
- ১৯৪৯ সালে সোভিয়েতের হামলার আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র তার ইউরোপীয় মিত্র দেশ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, কানাডা এই দেশগুলোকে নিয়ে NATO সামরিক জোট গঠন করে এবং সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের বিরোধিতা করা তাদের বিশ্বনীতি হিসাবে অভিহিত করে। সোভিয়েত ইউনিয়নও ১৯৫৫ সালে NATO এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, পূর্ব জার্মানি, রোমানিয়া দেশগুলোকে নিয়ে Warsaw চুক্তি স্বাক্ষর করে।

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

- **স্নায়ুযুদ্ধকালীন সংকট:** স্নায়ুযুদ্ধকালীন প্রধান সংকটগুলোর মধ্যে রয়েছে ১৯৪৮-৪৯ সালের বার্লিন অবরোধ, ১৯৫০-৫৩ পর্যন্ত হওয়া কোরিয়ান যুদ্ধ, ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরিয়ান বিপ্লব ও সুয়েজ ক্রাইসিস, ১৯৫৫ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সংঘটিত ভিয়েতনাম যুদ্ধ, ১৯৬১ সালের বার্লিন সংকট এবং ১৯৬২ সালের কিউবার ক্ষেপণাস্ত্র সংকট যা দুই রাষ্ট্রের মধ্যে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলে। পরে তৎকালীন দুই রাষ্ট্র প্রধানের মাঝে সরাসরি টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়। স্নায়ুযুদ্ধের সময় রাষ্ট্র দুইটি লাতিন আমেরিকা, মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার ক্ষয়িষ্ণু রাষ্ট্রগুলোতে প্রভাবের জন্য প্রতিযোগিতা করে গেছে।
- **স্নায়ু যুদ্ধকালীন অস্ত্র বিরতি চুক্তি:** ১৯৭০ থেকে ৮০ এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কিছু অস্ত্রবিরতি সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করে, যেমন: Anti-Ballistic Missile Treaty (১৯৭২), দুইটি Strategic Arms Limitation Treaties (SALT), The Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (১৯৮৭); Strategic Arms Reduction Treaty (১৯৯১) ইত্যাদি।

১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের দুর্বলতার সুযোগে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো সমাজতান্ত্রিক শাসন থেকে বের হয়ে আসতে শুরু করে এবং ১৯৮৯ সালের ৩ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মিখাইল গর্বাচেভ স্নায়ুযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

❖ **স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে সম্পর্ক:** ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায় এবং রাশিয়া সহ ১৫টি নতুন দেশের জন্ম হয়প্ম রাশিয়া সদ্য সাবেক হওয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরসূরী হিসেবে জাতিসংঘের নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদস্যপদ পায়প্ম সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে মিখাইল গর্বাচেভ পদত্যাগ করেন এবং তার স্থানে ক্ষমতায় আসা বরিস ইয়েলৎসিন এর সাথে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট সিনিয়র বুশ ও তার পরে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় ছিলপ্ম এ সময়কালের ভিতর রাশিয়া গণতান্ত্রিক বিশ্বে নিজেদের জায়গা করে নিতে চেষ্টা শুরু করে এবং দেশের ভিতরে তারা গণতান্ত্রিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পুঁজিবাদি ব্যবস্থা ও মুক্ত বাজার অর্থনীতি প্রচলন শুরু করেপ্ম ১৯৯৩ সালে রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ নামে একটি চুক্তিও স্বাক্ষর করেপ্ম সর্বোপরি রাশিয়া চেয়েছিল আন্তর্জাতিক মহলে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগী রাষ্ট্র হতেপ্ম যুক্তরাষ্ট্রও রাশিয়াকে তাগাদা দিতে থাকে যত দ্রুত সম্ভব উদারপন্থি পুঁজিবাদি রাষ্ট্রে পরিণত হতেপ্ম প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন অনেক বড় বড় আশা দিলেও সমস্যা হয় যখন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে তিন বিলিয়ন ডলারেরও কম বরাদ্দ দেয় অথচ ১৯৪০ সালের মার্শাল প্ল্যানের কথা মাথায় রেখে রাশিয়া আরো বড় আকারের সাহায্য আশা করেছিলপ্ম যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্কের অবনতি সেই থেকে শুরুপ্ম এরপর যুক্তরাষ্ট্র একতরফা ভাবে NATO এর আকার বাড়াতে থাকলে তা আরো খারাপ হয় কারণ রাশিয়া বিশ্বাস করতো সেটার আর প্রয়োজন নেইপ্ম ১৯৯৯ সালে মার্কিন নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী কর্তৃক সার্বিয়াতে আক্রমণ চালানো হলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটেপ্ম

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

❖ **সাম্প্রতিক সময়ে সম্পর্ক:** সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষকদের ভাষায় অপ্রত্যাশিতভাবে স্মরণকালের সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছেপ্ল

- ২০১৪ সালের ইউক্রেন সংকট ও রাশিয়া কর্তৃক ক্রিমিয়া দখল।
- সিরিয়াতে বাসার আল আসাদের পক্ষে রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর অংশগ্রহণ।
- ২০১৬ ও ২০২০ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ ইত্যাদি ইস্যুতে দুই দেশের মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলেছেপ্ল এর মাঝে ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হবার পর অপ্রচলিত কূটনৈতিক পদ্ধতিতে রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করলেও সে প্রচেষ্টা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নিপ্ল
- ইরান ও সিরিয়ায় সামরিক ও আর্থিক সাহায্যের প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার উপর একের পর এক অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করেছেপ্ল দুই পক্ষই নতুন নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার অভিযোগ তুলে পূর্বের অস্ত্র বিরতি চুক্তিগুলো থেকে সরে এসেছেপ্ল ২০২১ সালে জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবার পর একপ্রকার ঘোষণা দিয়ে রাশিয়ার সাথে বিরোধিতা সামনে নিয়ে এসেছেনপ্ল বাইডেন প্রশাসন এখন রাশিয়াকেই যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হিসেবে মনে করছে।

রাশিয়া - যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

- রাশিয়া কর্তৃক উত্তর কোরিয়া ও চীনকে সমর্থন করা ও তাদের অস্ত্র সহায়তা দেওয়া।
- ন্যাটোর সম্প্রসারণ নীতিতে রাশিয়ার ভেটো।
- ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখে রাশিয়া কর্তৃক পুনরায় ইউক্রেনে আগ্রাসন চালালে যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়া সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছায় ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মাঝে স্নায়ুযুদ্ধ নতুন আকারে দেখা দেয়।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবাজ পররাষ্ট্রনীতি

২০০১ সালে সেপ্টেম্বরের ১১ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে টুইন টাওয়ার ও পেন্টাগনে সন্ত্রাসী হামলার পর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জুনিয়র বুশের নেতৃত্বে আমেরিকা “সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে অনন্ত যুদ্ধ” শুরু করে। যদিও এই যুদ্ধকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও গ্লোবাল ক্যাপিটালিজমের উপর সন্ত্রাসী আক্রমণ প্রতিহত করার যুদ্ধ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়, কিন্তু এ রণনীতির বৈশিষ্ট্য ছিল খ্রিস্টান ইভানজেলিক ধারায় ইসলামের বিরুদ্ধে খ্রিষ্টীয় 'ক্রুসেড’ হিসেবে হাজির করা। বুশ যখন তার যুদ্ধকে 'ক্রুসেড’ বলায় নিন্দিত হলেন, তখন এই যুদ্ধের স্লোগান বদলে করা হলো- "স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার যুদ্ধ"। টুইন টাওয়ারের হামলার জন্য আলকায়দাকে দায়ী করে তাদের আশ্রয় দাতা হিসেবে আফগানিস্তানের তালেবানদের বিরুদ্ধে ২০০১ সালে যুদ্ধ ঘোষণা করে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক পশ্চিমা সেনাবাহিনী।

২০০৩ সালে ইরাকে পরমাণু ও জীবাণু অস্ত্র আছে এ অভিযোগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখল করে নেয়। মূলত এইসব যুদ্ধের নামে কোটি কোটি ডলারের ব্যবসা করছে মার্কিন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো। ইরাক ও আফগানিস্তানে যুদ্ধের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ হয় ৩.৭ ট্রিলিয়ন ডলার। যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেও ঐ সব দেশে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে পারেনি, উল্টো ইরাক ও আফগানিস্তানে জন্ম হয়েছে আত্মঘাতী বোমাসংস্কৃতি, ইরাক আফগানিস্তান এবং সর্বশেষ লিবিয়া, ইয়েমেন ও সিরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী যুদ্ধনীতির শিকার। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে জঙ্গি হামলা ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপে অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতার দিক দিয়ে পাকিস্তান রয়েছে আজ ভঙ্গুর অবস্থায়। ২০১১ সালে মে মাসে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে মার্কিন কমান্ডো বাহিনী কর্তৃক আল কায়েদার শীর্ষ নেতা ওসামা বিন লাদেনের হত্যাকাণ্ডের ঘটনা বিশ্ব রাজনীতি তথা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি ও দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির ভিতকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র

মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের স্বার্থ রক্ষা করা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কারণ ইসরায়েল মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন স্বার্থের রক্ষক ও মার্কিন সামরিক শক্তির প্রধান খুঁটি। ইসরায়েলের জন্মই হয়েছিল আরবে মুসলিম বিশ্বের মাঝখানে ব্রিটিশ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় আমেরিকা এ অঞ্চলে মার্কিন স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ইসরায়েলকে সহযোগিতা করার পরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় ইসরায়েলি লবিং এর প্রচণ্ড ক্ষমতা রয়েছে। তবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করে না বরং বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে থাকে। বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাই যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলকে একই ধরনের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। মার্কিন কংগ্রেস কোনোরূপ প্রশ্ন ছাড়াই ১৯৮৫ সাল থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের সামরিক ও আর্থিক সাহায্য ইসরায়েলকে দেওয়ার অনুমোদন দেয়। সকল পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ ইসরায়েলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি মার্কিনিদের অকুণ্ঠ সমর্থনকে প্রশংসার চোখে দেখে। জাতিসংঘসহ অন্যান্য ফোরামে অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ যখন ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গের দায়ে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করে তখন প্রায়ই যুক্তরাষ্ট্র একা তাদের পক্ষে অবস্থান নেয়।

মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবিতে ভেটো প্রদান করে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকে বিঘ্নিত করে আসছে। ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুই দেশের জনগণের জন্য দুটি পৃথক রাষ্ট্রই একমাত্র সমাধান এবং কেবল সরাসরি সংলাপের মাধ্যমেই তা অর্জিত হতে পারে- এটাই যুক্তরাষ্ট্রের দাবি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংকট সমাধানে সমঝোতা আলোচনায় বিশ্বাসী-এ ধরনের কথা বলে আসলেও ২০১৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তেল আবিব থেকে জেরুজালেমে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থানান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করা, ইসরায়েলি বাহিনী কর্তৃক ফিলিস্তিনের গাজায় অমানবিক সহিংস হামলা ও বসতি উচ্ছেদের পরও নব্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেনের একপাক্ষিকভাবে ইসরায়েলের পক্ষ অবলম্বন করে দেওয়া বক্তব্য ও অর্থ সাহায্যের ঘোষণা ইত্যাদি কর্মকাণ্ড থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলের স্বার্থ সংরক্ষণের একরোখা নীতি থেকে সরে আসবে না।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র

মাত্র এক বছরে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ৩৭% বৃদ্ধি পাওয়ায় এ অঞ্চলকে ইন্দো-প্যাসিফিক ইকোনমিক করিডোর হিসেবে চিহ্নিত করে যুক্তরাষ্ট্র। দুটি দেশের মধ্যে পৃথিবীর বৃহত্তম সামরিক অনুশীলন হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের মতে ভারত বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ১৩তম বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার। গত ২০ বছরে ভারতের জিডিপি ১০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আগামী ২০২৫ সাল নাগাদ ভারত হবে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। ফলে বদলে যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতির সমীকরণ। ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের বিবর্তন প্রসঙ্গে মার্কিন কংগ্রেসম্যান Dana Rohrabacher এর এই মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য- “ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীন হবার পরবর্তী সময়গুলোতে মার্কিন-ভারত সম্পর্ক ছিল খুবই খারাপ। স্নায়ুযুদ্ধের সময় ভারতের অবস্থান ছিল রাশিয়ার পক্ষে, কিন্তু এখন তো স্নায়ুযুদ্ধ শেষ। এখন আমাদের উচিত ঐ সময় আমরা যা হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করা। তাছাড়া, চীনকে সামাল দিতে ভারত অধিকতর সক্ষম একটি শক্তি, যেহেতু সে আকৃতি ও জনসংখ্যার দিক থেকে চীনের কাছাকাছি এবং পাশাপাশি অবস্থিত। দক্ষিণ এশিয়ার আর কোনো রাষ্ট্রেরই এককভাবে এই যোগ্যতা নেই।"

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র

ভারত বিভাগের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পুরো অঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনবিরোধী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান, ইরান ও তুরস্ক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন। একাধিক সামরিক চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সামরিকীকরণকেই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছিল। ভারত-পাকিস্তান বিরোধ, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি এজন্য ছিল খুব ভালো উপলক্ষ্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে ভারতের সুসম্পর্কের সময় যুক্তরাষ্ট্র কাশ্মীর প্রশ্নে ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের শুরুতেও পাকিস্তান ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একনিষ্ঠ সহযোগী। এখনও পাকিস্তানকে সহযোগী হিসেবে পাশে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর পাকিস্তানের সামরিক খাতে কোটি কোটি ডলার অর্থ সহায়তা দিয়ে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক ইসলামী জঙ্গিদল গুলোকে সমর্থন ও আশ্রয় দেওয়া, পাকিস্তানে আল কায়দা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়া, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইরান, লিবিয়া, উত্তর কোরিয়া ইত্যাদি দেশকে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রযুক্তি সরবরাহ ইত্যাদি অভিযোগে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুনভাবে ভাবতে হচ্ছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র

ASEAN তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের নেয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ, যেমন এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরে তার নৌ উপস্থিতি বাড়ানোর ঘোষণা, মিয়ানমারের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্কের উন্নতি করে এশিয়ায়, ভারত মহাসাগরে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি রোধ করা ইত্যাদি এখন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির আরেকটি অগ্রগণ্য দিক। জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশের সাথে বিভিন্ন সময়ে সামরিক মহড়ার আয়োজন করে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের আগ্রাসন প্রতিহত করার চেষ্টা করছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

ঞ

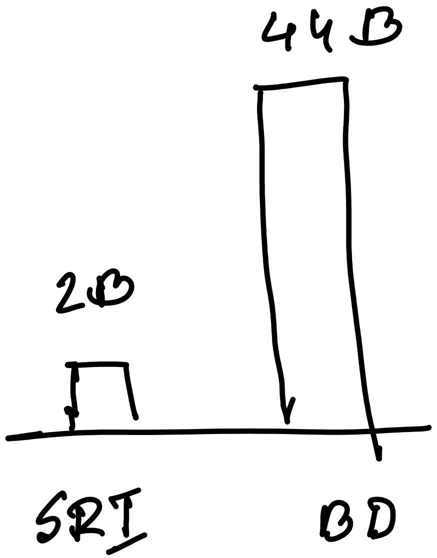

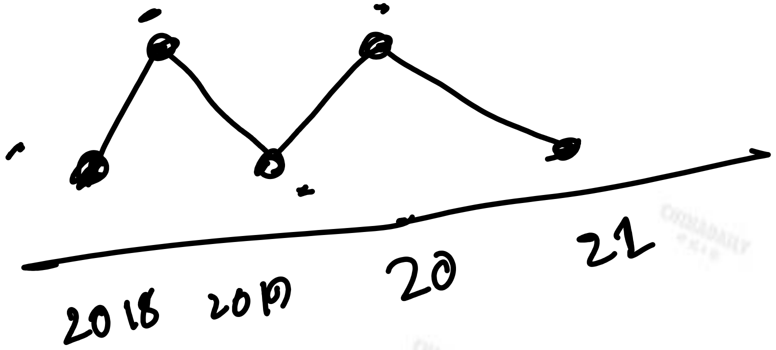

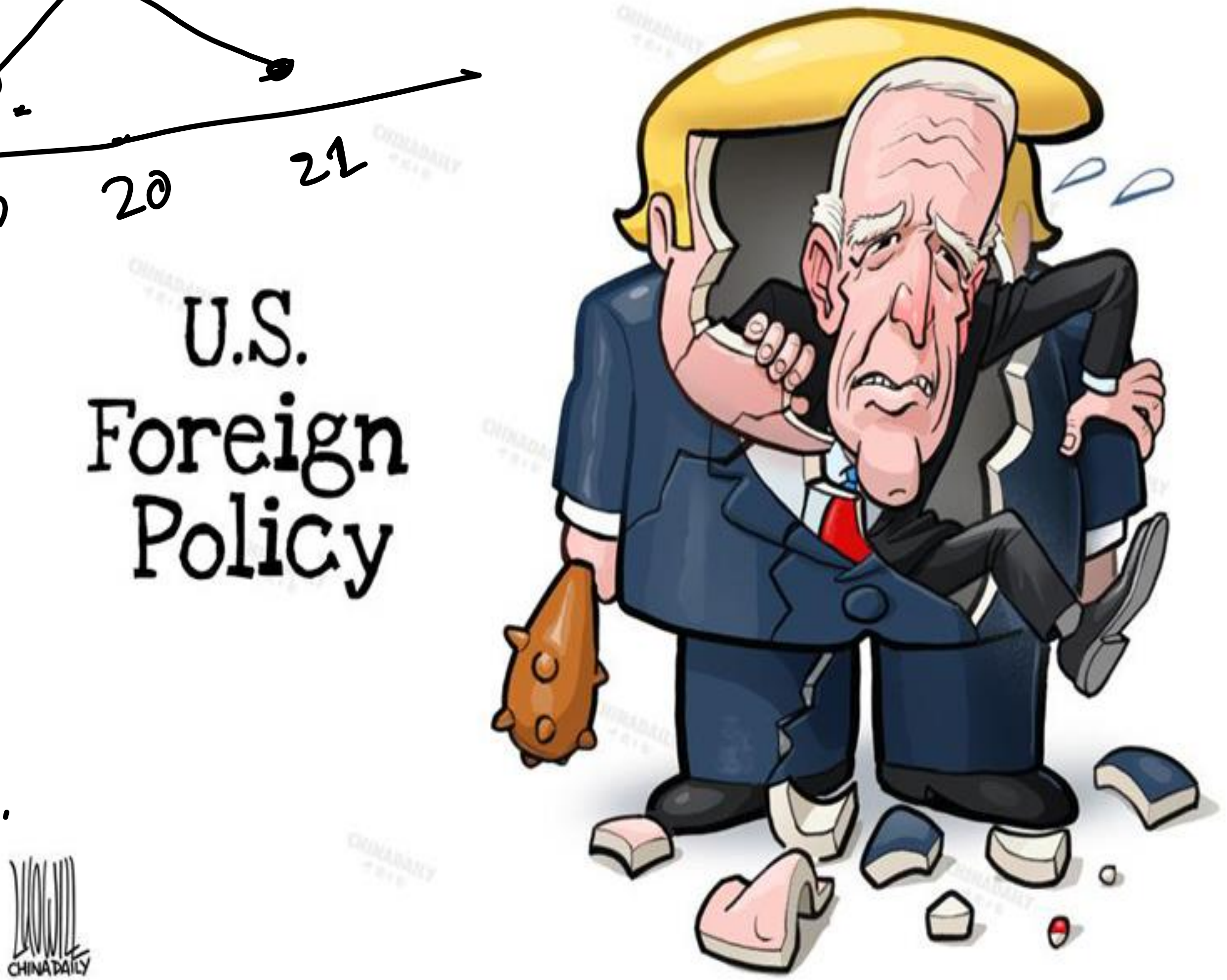
U.S.
Foreign
Policy
CHINADAILY

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

- কট্টরপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পরই কিছু পদক্ষেপ নেয় যা মুসলিম বিশ্বের প্রতি তার বিদ্বেষ প্রকাশ করে।
- এর মধ্যে ৭টি মুসলিম প্রধান দেশের নাগরিকদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা, পারমাণবিক জ্বালানি মজুদ প্রশ্নে ইরানের সাথে ৬ জাতি আলোচনা থেকে বের হয়ে আসা, ইয়েমেনে সৌদি হামলায় মদদ দেওয়া, ইরানের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি কাশেম সোলায়মানিকে হত্যা ইত্যাদি কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বেই এক ধরনের অস্বস্তি ও উত্তেজনাময় পরিবেশ বজায় ছিলো।
- একই সাথে ট্রাম্প আফগানিস্তানে তালেবানদের সাথে শান্তি চুক্তি করে সেখান থেকে মার্কিন সেনাদের ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দেন।
- এ বছরের জানুয়ারিতে জো বাইডেন ক্ষমতা গ্রহণের পর ইতোমধ্যে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে বেশ কিছু জায়গায় ট্রাম্পের নেওয়া সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

❖ ইরানের সাথে পারমাণবিক চুক্তি

- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য ও জার্মানির সঙ্গে ২০১৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে তিন বছর পর অর্থাৎ ২০১৮ সালে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বেরিয়ে যান এবং পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন নিষেধাজ্ঞা জারি করেন।

- পারমাণবিক বিস্তার রোধ ও অন্যান্য নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা থেকে মুক্তির প্রশ্নে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নির্বাচনের আগে বিভিন্ন চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছিলেন।

- গত বছর নির্বাচনের আগে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত এক বক্তৃতায় জো বাইডেন বলেছিলেন, তেহরান যদি চুক্তি মেনে চলতে রাজি থাকে, তবে আমি চুক্তিতে ফেরত যাব এবং একে আরও প্রসারিত ও শক্তিশালী করতে আমাদের মিত্রদের সঙ্গে কাজ করব। একই সঙ্গে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে এমন সব কাজ থেকে ইরানকে বিরত রাখতে কার্যকর পদক্ষেপ নেব।’

- কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইহুদিবাদী রাষ্ট্র ইসরায়েল ইরানকে তাদের অস্তিত্বের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি মনে করে। কাজেই তারা ইরানের ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কর্মসূচির প্রচণ্ড বিরুদ্ধাচরণ করছে।

- তাই মুখে যাই বলুক ইসরায়েলের শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে পরিচিত জো বাইডেন ইরানের ওপর থেকে তাঁর পূর্বসূরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত অর্থনৈতিক ও অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা খুব শীঘ্রই প্রত্যাহার করতে যে রাজি নন- তা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে পড়ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

❖ আফগানিস্তান

➲ বাইডেন প্রশাসন ২০২১ এর মে এর মাঝে আফগানিস্তান থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার শিকার হয়েছিলো।

➲ নির্বাচনের আগে বাইডেনের উপদেষ্টারা বলেছিলেন, সেখানে সামরিক উপস্থিতি কমানোর পাশাপাশি আফগানিস্তানের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখা হবে। তবে এ কাজটি কীভাবে করা হবে, সে সম্পর্কে তাঁরা তখন বিস্তারিত কিছু বলতে পারেননি।

➲ তখন যুক্তি দেওয়া হয়েছিলো, ট্রাম্প প্রশাসনের পর বাইডেন ক্ষমতায় এলে তিনি সেখানে কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হন, তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। ফলে ট্রাম্প প্রশাসনের মতো বাইডেন প্রশাসনও তালেবানদের সঙ্গে মার্কিন প্রতিনিধিদের সরাসরি কাজ করতে সবুজ সংকেত দেবে কিনা, তা আগে থেকে বলা যায়নি।

➲ নির্বাচনে জয় লাভ করার পর গত ১৪ এপ্রিল বাইডেন ঘোষণা করেছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র মে মাসের পরিবর্তে সেপ্টেম্বর এর মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সমস্ত সেনা প্রত্যাহার করবে। এটি সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ায় দীর্ঘ ২০ বছর পরে আফগানিস্তানের মাটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ সামরিক অভিযানের অবসান ঘটল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

❖ ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল সম্পর্কিত নীতি

➲ ট্রাম্প জেরুজালেমকে ইসরায়েলের একক রাজধানীর স্বীকৃতি দেয় এবং জেরুজালেমে মার্কিন দূতাবাস স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এতে পূর্বজেরুজালেমসহ অধিকৃত ফিলিস্তিনে ইসরায়েল, পশ্চিম তীরসহ বেআইনি বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়।

➲ ট্রাম্প ইসরায়েলের অধিকৃৎ গোলান মালভূমিতে ইসরায়েলের অন্যায় ও অবৈধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, যা আন্তর্জাতিক আইনে সম্পূর্ণ অবৈধ। এছাড়াও কিছু আরব রাষ্ট্র যেমন- আরব আমিরাত, বাহরাইন, সুদান ট্রাম্পের কূটনৈতিক কুশলতায় ইজরায়েলকে স্বীকৃতি দেয়। ট্রাম্পের সময়ে অর্জিত এসব অর্জন মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভুত্ব বৃদ্ধি করে।

➲ বাইডেন প্রশাসনের জন্য ট্রাম্পের এই সিদ্ধান্তকে উল্টে দেওয়া কঠিন হবে। বাইডেন ঘোষণা দিয়েছেন, ইসরায়েলে মার্কিন দূতাবাস আবার তেল আবিবে স্থানান্তর করা হবে না। তবে তিনি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে মার্কিন প্রশাসনের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবেন।

➲ এছাড়াও, পূর্ব জেরুজালেমে ফিলিস্তিনিদের জন্য মার্কিন কনস্যুলেট খোলা হবে। ফিলিস্তিনিদের সরাসরি মার্কিন সহায়তা দেওয়া ও সেখানে কাজ করা জাতিসংঘের সংস্থাগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করবেন।

➲ একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে প্যালেস্টিনিয়ান লিবারেশন অর্গানাইজেশনের (PLO) মিশন পুনঃস্থাপন করে ফিলিস্তিনকে সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন বাইডেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জো বাইডেনের পররাষ্ট্রনীতির পার্থক্য (মুসলিম দেশসমূহের সাথে)

- ইসরাইল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বাইডেনের উপদেষ্টা ব্রায়ান ম্যাককিয়ন CNN কে বলেছেন, বাইডেন ইসরায়েল রাষ্ট্রের একজন সমর্থক এবং তিনি দেশটিকে সহায়তা দেবেন। একই সঙ্গে বাইডেন দুই রাষ্ট্র নীতিরও সমর্থক। এই নীতির বিরুদ্ধে যায়, এমন কোনো পদক্ষেপ তিনি নেবেন না।

- প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যে ইসরাইলকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন দেওয়ার কোন বিকল্প ভাবছেন না তা প্রমাণিত হয় ২০২১ এর মে মাসে সংঘটিত ইসরাইল ও ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সহিংসতার সময়, যখন ইসরাইলি বিমান হামলায় শত শত ফিলিস্তিনি নাগরিক ও শিশুরা নিহত হচ্ছিলো।

- বাইডেন দুই পক্ষকে যুদ্ধবিরতির আহবান জানালেও একই সাথে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশের চেষ্টা আটকে দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ নিয়ে তিনবার ইসরাইলের সামরিক অভিযান বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের চেষ্টাকে আটকে দেয় যুক্তরাষ্ট্র।

- এছাড়াও ইসরাইলকে ৭৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার মূল্যের অত্যাধুনিক অস্ত্র বিক্রির যে প্রস্তাব প্রেসিডেন্ট বাইডেন সম্প্রতি অনুমোদন করেছেন তা নিয়ে নিজ দল ডেমক্রেটিক পার্টিরই কিছু সদস্যের সমালোচনার মুখে পড়েছেন।

E.R

অর্থনৈতিক সমীক্ষা 2022

চীনের পররাষ্ট্রনীতি

চীনের পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু

- শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন ও স্বতন্ত্রের নীতি অনুসরণ করা, যে কোনো বড় দেশ বা দেশ-গোষ্ঠীর সঙ্গে শত্রুতা না করা, অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতায় অংশ না নেওয়া, সামরিক শক্তি সম্প্রসারণ না করা।
- আধিপত্যবাদের বিরোধিতা করা, বিশ্বশান্তি রক্ষা করা, দেশ বড় কিংবা ছোট হোক, শক্তিশালী কিংবা দুর্বল হোক, গরিব কিংবা ধনী হোক, সবাই আন্তর্জাতিক সমাজের একই মর্যাদাপ্রাপ্ত সদস্য। রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে পরামর্শের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে পরস্পরের দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ নিষ্পত্তি করা উচিৎ, বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের দ্বারা হুমকি প্রদর্শন করা উচিত নয়, যে কোনো অজুহাতে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।
- সক্রিয়ভাবে ন্যায় ও যুক্তিযুক্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতি আর অর্থনীতির নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার কাজকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পঞ্চশীল নীতি আর অন্যান্য গণ-স্বীকৃত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মানদণ্ড আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির নতুন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করার ভিত্তি হওয়া উচিত।
- পরস্পরের সার্বভৌমত্ব আর ভূ-ভাগের অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, পারস্পরিক অনাক্রমণ, পরস্পরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা।
- সার্বিকক্ষেত্রে বৈদেশিক উন্মুক্তদ্বার নীতি প্রচলন করে সমতা আর পারস্পরিক উপকারিতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্বের সকল দেশ আর অঞ্চলের সঙ্গে ব্যাপকভাবে বাণিজ্য আদান-প্রদান, অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির যোগাযোগ করবে এবং অভিন্ন সমৃদ্ধি ত্বরান্বিত করবে।
- সক্রিয়ভাবে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠিত করা।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

নয়া স্নায়ুযুদ্ধ : চীন মার্কিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক প্রবণতা

- **নয়া স্নায়ু যুদ্ধের উৎপত্তি:** ২০০০ থেকে ২০১০ এর দশকে অনেক বিশ্লেষক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে উত্তেজনা বোঝাতে ‘প্রশান্ত মহসাগরীয় শীতল যুদ্ধ’ শব্দটি ব্যবহার করেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর নির্বাচনি প্রচারণার সময় চীনকে একটি হুমকি হিসেবে উল্লেখ করেন যা চীনের সাথে নয়া স্নায়ু যুদ্ধের জল্পনাকে বাড়িয়ে তোলে। প্রকৃতপক্ষে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার মধ্যে দিয়ে রাশিয়ার সাথে নয়া স্নায়ু যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং চীনকে যুক্তরাষ্ট্র প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা শুরু করে।

১৯৪৯ সালে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশকারী নয়া চীন নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার আলোকে পরিচালিত হয়ে অনেক এগিয়েছে। প্রথম ৪০ বছর তেমন কোনো সফলতা না দেখাতে পারলেও নব্বইয়ের দশকের শুরু থেকে চীন ক্রমাগত বিশ্ব বাণিজ্যে প্রবেশ করতে থাকে। অবশেষে চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মার্কিন অর্থনীতির প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়েছে। বিশ্বের সকল পণ্য উৎপাদনের প্রাণকেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়েছে চীন। বিশ্ব অর্থনীতিতে চীনের এই অবস্থান সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মেনে নিতে পারেনি। নিজে দেশে জাতীয়তাবাদী ধারণা উসকে দিয়ে চীনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাণিজ্য অবরোধ আরোপ শুরু করে ট্রাম্প। তখন থেকেই চীনের উপর নিষেধাজ্ঞা, চীনের পাল্টা নিষেধাজ্ঞা, চীন বিরোধী বিভিন্ন জোট গঠন, চীন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্পের পাল্টা প্রকল্প গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নতুন শীতল যুদ্ধ চলমান থাকে।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

- **চীনের সাথে নয়া স্নায়ু যুদ্ধের কারণ:** বিশ্ব অর্থনীতিতে চীন অন্যতম শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । যা যুক্তরাষ্ট্র তার একক আধিপত্যের প্রতি হুমকি হিসেবে বিবেচনা করছে। ২০৩০ সালে চীনের জিডিপি হবে ২২.১ ট্রিলিয়ন ডলার আর যুক্তরাষ্ট্রের ২৪.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে PPP তে চীন হবে প্রথম। এছাড়া চীনের BRI পরিকল্পনায় ৬১টি দেশকে চীনের আওতায় আনা, ভারত মহাসাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধি (জিবুতিতে নৌঘাঁটি), আফ্রিকাতে চীনের বিশাল বিনিয়োগ (সাবসাহারা আফ্রিকাতে ২৯৯ মিলিয়ন + ৬০ মিলিয়ন ডলার), যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ মাত্র ৪৭.৮১ মিলিয়ন ডলার, কৌশলগত ও অর্থনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া, নৌশক্তি হিসেবে চীনের আবির্ভাব ইত্যাদি বিষয় মার্কিন চিন্তাবিদদের চিন্তায় ফেলে। এর সাথে রয়েছে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি। ২০২২ সালে এই বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৩৮২.৯ বিলিয়ন ডলার। শুধু তাই নয় চীনের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ ২০২১ সালে ছিল ১.০৯৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে চীনই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

- **নয়া স্নায়ু যুদ্ধের পথ রেখা:**

১. ২০২১ সালের জি-৭ সম্মেলনে চীনকে মোকাবিলায় ছিল প্রধান অ্যাজেন্ডা। বিশ্বে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব মোকাবিলায় জি-৭ বৈঠকে Build Back Better World (B3W) নামক একটি উদ্যোগের প্রস্তাব করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর মাধ্যমে স্বল্প আয়ের দেশগুলোকে ঋণ সহায়তা দেওয়া হবে, যেটি স্পষ্টতই চীনের BRI প্রকল্পের পাল্টা প্রকল্প।

২. ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র চারটি দেশের একটি জোট গঠন করে যা কোয়াড (Quadrilateral Security Dialogue- Quad) নামে পরিচিত। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির অংশ। আফগানিস্তান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া প্যাসিফিকে চীনের আরও কাছাকাছি নিজেকে সুসংহত করছে। কারণ দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বেই চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক প্রভাব মোকাবিলা করা ইন্দো-প্যাসিফিক নীতির লক্ষ্য, যা বাস্তবায়নে কাজ করছে কোয়াডও। ফলে দক্ষিণ এশিয়া তথা ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের মধ্যে এক ধরনের ঠান্ডা লড়াই বা মেরুকরণ দৃশ্যমান হয়েছে।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

৩. শীতল যুদ্ধের ছায়া পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে আয়োজিত The Summit for Democracy- তে। ভার্চুয়াল প্লাটফর্মে সম্মেলন উদ্বোধনের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বিশ্বের গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে লড়াইয়ের কথা বলেছেন। প্রথমবারের মতো আয়োজিত এতো বড় সম্মেলনে বিশ্বের ১১০ দেশকে আমন্ত্রণ জানালেও রাশিয়া ও চীনের কাউকে এ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানায়নি যুক্তরাষ্ট্র। এর পাল্টা হিসেবে চীনও একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে সেখানে বিশ্বের ১২০টি দেশ থেকে গবেষক ও অধ্যাপকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

৪. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করতে যুক্তরাষ্ট্র Quad, IPEF, AUKUS, Partners in the Blue pacific প্রভৃতি জোট গঠন করেছে। এর পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে চীন গঠন করেছে হিমালয়ান কোয়াড। চীন, নেপাল, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে নিয়ে গঠিত এ হিমালয়ান কোয়াড।

৫. রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা শক্তি ইউক্রেনকে সহায়তার প্রেক্ষাপটে রাশিয়ার সাথে চীনের সখ্য গড়ে উঠেছে। এমনকি বিশ্ব নেতৃত্বে চীনের অবস্থান জানান দিতে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ নিরসনে শান্তি প্রস্তাবের দিক নির্দেশনা দিয়েছে চীন।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক

৬. চীনের বিরুদ্ধে পশ্চিমা শক্তির প্রপাগান্ডার জবাব দিতে চীন পূর্বের রক্ষণাত্মক ও সহিষ্ণু কূটনীতি ত্যাগ করে আগ্রসী কূটনীতি গ্রহণ করেছে যা ‘উলফ ওয়ারিয়র কূটনীতি’ নামে পরিচিতি পেয়েছে। চীনের স্বার্থ রক্ষার্থে চীনের একেক জন কূটনীতিক হয়ে উঠেছেন উলফ ওয়ারিয়র। মূলত তারা বিশ্ববাসীকে জানান দিতে চায়, চীন আর আগের মতো নমনীয় নয়, শত্রুর কাছে নিজের সক্ষমতা গোপন করে নয় বরং প্রকৃত সক্ষমতা জানান দিতেই তৎপর। পাশাপাশি পশ্চিমা মিডিয়াগুলোর বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের অপপ্রচারের মোক্ষম জবাব দিবে চীন।

চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

পাক ভারত যুদ্ধে চীনের অবস্থান

১৯৬৫ এবং ১৯৯৯ সালে কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে চীন পাকিস্তানকে সহায়তা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ নিয়ে পাকিস্তানের সাথে ভারতের আরেকটি যুদ্ধ হয় (৩ ডিসেম্বর-১৬ ডিসেম্বর) যেখানে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

তিব্বত নিয়ে চীন ও ভারতের দ্বন্দ্ব

১৯৫০ সালে চীন, ভারত-চীনের মধ্যবর্তী রাষ্ট্র তিব্বত দখল করে নেয়। এসময় তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মগুরু এবং বিপ্লবী নেতা " দালাইলামা " ভারতে আশ্রয় নেয়। দালাইলামাকে নিয়ে চীন-ভারত সম্পর্কের চরম অবনতি হয়। দালাইলামা ভারতে নির্বাসিত তিব্বত সরকার গঠন করেন ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৯ সালে চীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ দালাইলামা চীন-ভারত সম্পর্কের অন্যতম নিয়ন্ত্রক।

কাশ্মীর নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

Break
৪:৩০

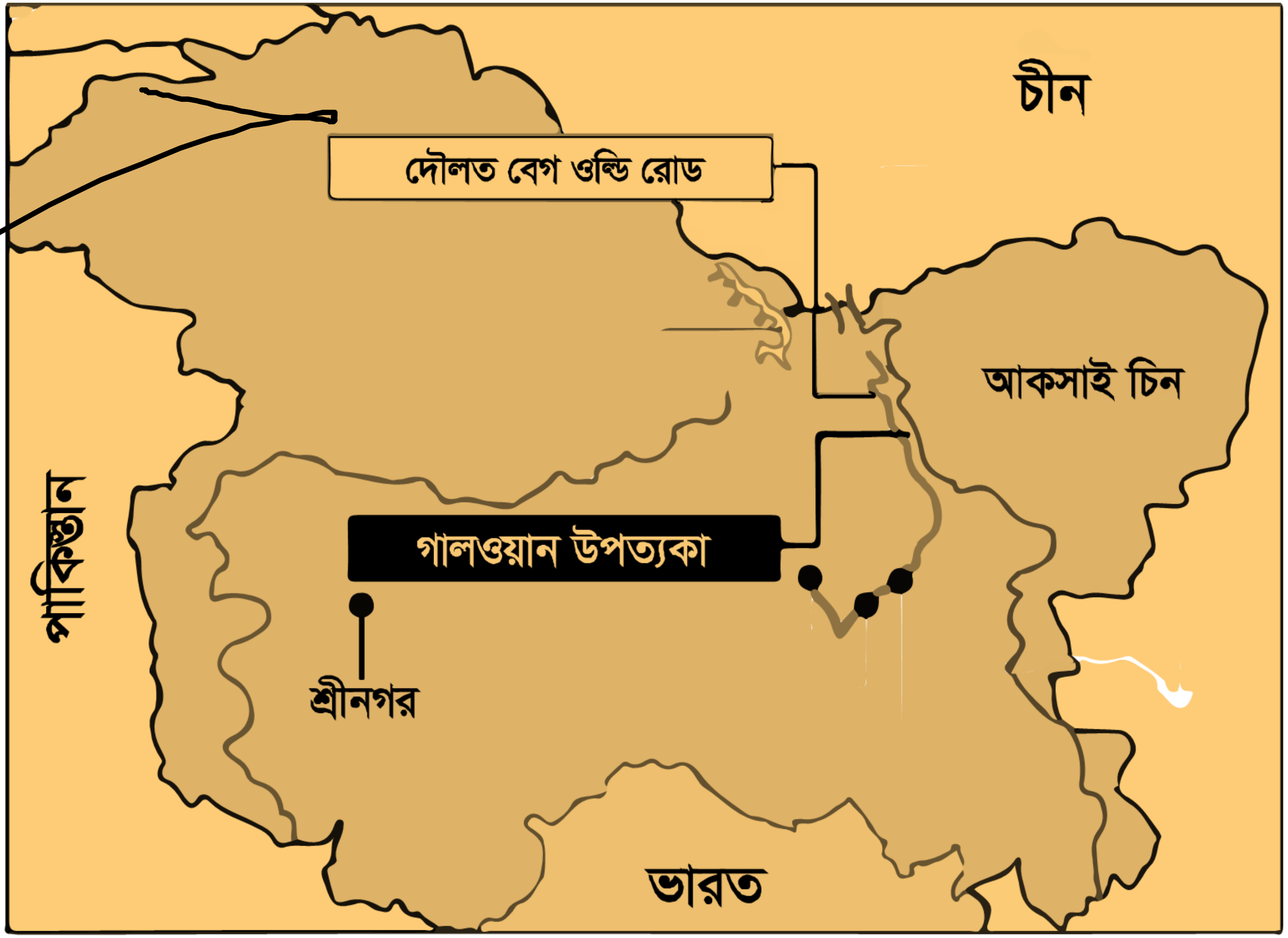
চীন
দৌলত বেগ ওল্ডি রোড
আকসাই চিন
পাকিস্তান
গালওয়ান উপত্যকা
শ্রীনগর
ভারত

চিত্র: ভারত-চীন সীমান্ত সংঘাত (গালওয়ান উপত্যকা)

কাশ্মীর নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

ডোকলাম সংকট

২০১৭ সালের জুন থেকে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা চলছে। দেশ দুটির মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত হয় ডোকলাম অঞ্চলে চীন একটি সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু করার পর। এই মালভূমি অঞ্চলটি ভুটান ও চীন দুই দেশই তাদের বলে দাবি করে। এই অঞ্চলটি চীন, ভুটান ও ভারতের সিকিম প্রদেশের সংযোগস্থলের মালভূমি এলাকা। দাবির ক্ষেত্রে ভারত ভুটানের পক্ষে। ভারত মনে করে চীন যদি এ রাস্তাটি তৈরি করে তাহলে কৌশলগতভাবে ভারত পিছিয়ে পড়বে। চীন এমন জায়গায় সড়ক নির্মাণ করতে চাইছে যার পাশেই ভারতের ২০ কিলোমিটার চওড়া একটি করিডোর আছে। এ করিডোরের মাধ্যমে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলো মূল ভারতের সাথে সংযোগ রক্ষা করে। চীন বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে বলেই সেখানে তাদের কৌশলগত অবস্থান জোরদারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। আর দ্বন্দ্ব মূলত এ কারণেই।

কাশ্মীর নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

লাদাখ নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

ভূ-রাজনৈতিক কারণে লাদাখের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬২ সালে চীন এই অঞ্চলের আকসাই চীন দখল করে নেয়। ভারত এটিকে নিজেদের অংশ বলে দাবি করে আসছে। ২০২০ সালের জুন মাসে এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভারত-চীন দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছে। সংঘাতে ভারতের প্রায় ২০ জন সেনা নিহত হন। বর্তমানে লাদাখে ৬টি বিরোধ পূর্ণ ‘হটস্পট’ রয়েছে। সীমান্তের দুই পাশে চীন ও ভারত দুই দেশই সেনা মোতায়েন করে রেখেছে। বিশ্লেষকদের মতে, ভবিষ্যতে লাদাখ নিয়ে দেশ দুটির সংঘাত আরো দীর্ঘায়িত হবে।

BRI প্রকল্প নিয়ে বিরোধ

চীনের Belt and Road Initiative প্রকল্পে একসময় ভারত আগ্রহ দেখালেও বর্তমানে ভারত তাদের মনোভাব ফিরিয়ে নিয়েছে। কারণ এ অঞ্চলে ভারত চীনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এই প্রকল্পের বিকল্প হিসেবে ভারত ‘কটন রুট’ তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ফলে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দেশ দুটি ক্রমান্বয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়ছে।

কাশ্মীর নিয়ে চীন-ভারত দ্বন্দ্ব

ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ইস্যু

চীনকে পরাশক্তি হতে দমিয়ে রাখার নীতি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র IPS ঘোষণা করেছে। এই IPS এর প্রধান অংশীদার ভারত, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র। যেহেতু ভারত IPS এর প্রধান অংশীদার তাই এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত সম্পর্কে তিক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

QUAD ইস্যু

Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) হলো যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সমন্বয়ে গঠিত একটি সামরিক জোট। একে এশিয়ার NATO বলা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য চীনের অর্থনৈতিক ও সামরিক অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা। যেহেতু ভারত এ জোটের প্রধান অংশীদার তাই এ ইস্যুকে কেন্দ্র করে চীন-ভারত তিক্ততা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

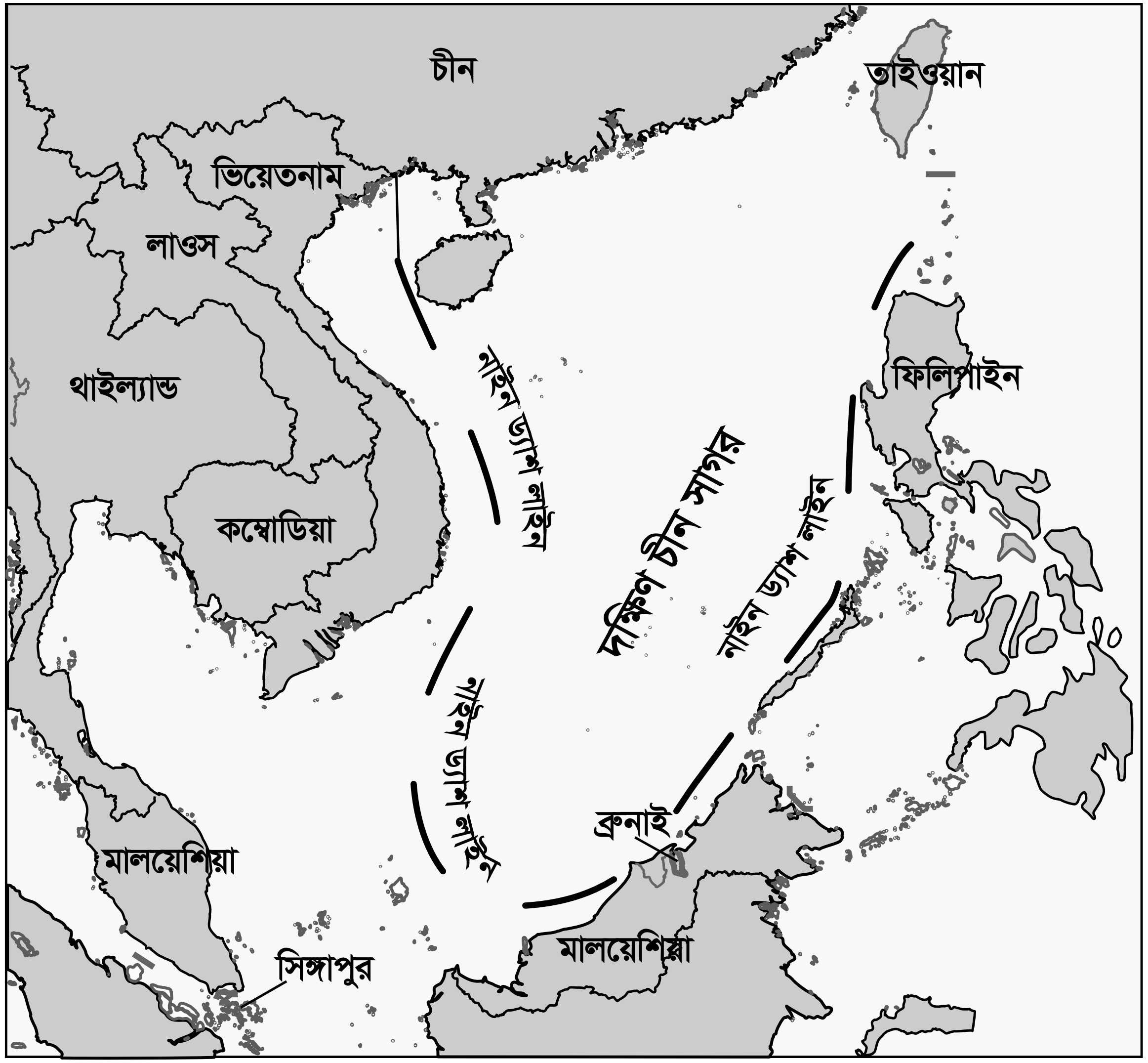
চীন
তাইওয়ান
ভিয়েতনাম
লাওস
থাইল্যান্ড
কম্বোডিয়া
ফিলিপাইন
দক্ষিণ চীন সাগর
নাইন ড্যাশ লাইন
নাইন ড্যাশ লাইন
নাইন ড্যাশ লাইন
নাইন ড্যাশ লাইন
ব্রুনাই
মালয়েশিয়া
মালয়েশিয়া
সিঙ্গাপুর

চিত্র: দক্ষিণ চীন সাগরের নাইন ড্যাশ লাইন

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে বিরোধের কারণ

- সার্বভৌমত্বের বিবাদ নিয়ে ওই অঞ্চলটি এখন প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দক্ষিণ চীন সাগরের দ্বীপ ও সামুদ্রিক অঞ্চলের দাবি নিয়ে ব্রুনাই, চীন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম-এর মধ্যে মতবিরোধ বর্তমান। স্প্রাটলি ও প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ এবং টনকিন উপসাগর নিয়ে এই মতবিরোধ। ২০১২ সাল থেকে পুরো প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ চীনের অধীনে। এ ছাড়া স্প্রাটলি দ্বীপপুঞ্জের ৮টি দ্বীপ চীন, ২৯টি দ্বীপ ভিয়েতনাম, ৮টি দ্বীপ ফিলিপাইন, ৫টি দ্বীপ মালয়েশিয়া, ২টি দ্বীপ ব্রুনাই এবং ১টি দ্বীপ তাইওয়ানের অধীনে। চীন দক্ষিণ চীন সাগরের প্রায় ৯০ শতাংশ এলাকা নিজেদের বলে দাবি করেছে। চীন নিজেদের সরকারি মানচিত্রে তথাকথিত নাইন-ডটেড লাইন দিয়ে এই অঞ্চল নির্দিষ্ট করেছে, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত। ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, ব্রুনাই এবং তাইওয়ানও এই সামুদ্রিক অঞ্চলের দাবি জানিয়েছে। ফিলিপাইন তার অধিকার নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে গেলে ২০১৬ সালে আদালত ফিলিপাইনের পক্ষে রায় দিয়েছিল। চীন ইতোমধ্যেই অধিকৃত স্প্রাটলি অঞ্চলের ৬টি ডুবো পাহাড়ের উপর ড্রেজিং-এর মাধ্যমে কৃত্রিম দ্বীপ নির্মাণ করেছে।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

- দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধের মূল কারণ হলো Nine Dots Line। চীন তার দক্ষিণের হাইনান প্রদেশে একটি বিন্দু বসিয়ে তা থেকে সোজা চলে এসে Golf of Thailand-এ আরেকটি বিন্দু বসায়। যা একটি U আকৃতির সৃষ্টি করে। এই লাইনটি শেষ হয় ফিলিপাইন সাগরে এসে। মূলত এই লাইন এর কারণে দক্ষিণ চীন সাগরের ৮০ ভাগ চীনের দখলে চলে আসে। ১৯৪৭ সালে চীনে ন্যাশনালিস্ট পার্টি ক্ষমতায় থাকার সময় প্রথম এই লাইনটি ঠিক করে। তখন তারা এতে এগারোটি ডট ব্যবহার করে এবং এর নাম দেয় Eleven Dots Line। এরপর ১৯৫০ সালের দিকে কমিউনিস্টরা ক্ষমতায় আসলে এর দুইটি ডট কমিয়ে দেয় এবং নিজেদের প্রাধান্য বিস্তারের জন্য তারা এর নামকরণ করে Nine Dots Line। কিন্তু এর সীমানা একই থাকে।
- অপর আরেকটি বিরোধ হচ্ছে EEZ বা Exclusive Economic Zone নিয়ে। জাতিসংঘের সমুদ্রসীমা সংক্রান্ত আইন (UNCLOS) অনুযায়ী যদি এখানে কোনো দেশ EEZ তৈরি করতে চায় তবে তা চীনের Nine Dots Line-এর সাথে 'ওভারল্যাপ' করে। ফলে এটা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধে জড়িত দেশগুলো হলো চীন, তাইওয়ান, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনাম।
- আরেকটি বিরোধের নাম Luzon প্রণালি। এই Luzon প্রণালি ফিলিপাইন ও তাইওয়ানের মাঝে অবস্থিত ২৫০ কিলোমিটার চওড়া একটি প্রণালি। এটা নিয়ে ফিলিপাইন, চীন ও তাইওয়ানের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দক্ষিণ চীন সাগরের কর্তৃত্ব চায় বেইজিং। কেননা, বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্যিক জাহাজ এ সাগরের উপর দিয়ে চলাচল করে। চীন পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তেলভর্তি ও মালবাহী জাহাজ চলাচলের নিয়ন্ত্রণ ও যে কোনো হুমকি মোকাবিলা বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রসহ বিদেশি সামরিক শক্তির উপস্থিতি ঠেকাতে চায়। এছাড়া চীনের লক্ষ্য হলো- সাগরতলের বিপুল তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত দখলে নিয়ে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করা। চীন এ সাগরের মালিকানা দাবি করে শি ও হান রাজবংশের কর্তৃত্ব অনুযায়ী।
- দক্ষিণ চীন সাগরের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার প্রধান কারণ হলো চীনের মোকাবিলা করা। আর তাই যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে সব ধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে আসছে। এমনকি চীন-জাপান যখন মুখোমুখি তখন জাপানের পক্ষে নৌ শক্তিও প্রেরণ করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। দক্ষিণ চীন সাগর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার অপর একটি কারণ হলো কোরিয়া উপদ্বীপের রাজনীতি। উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক শক্তিশালী দেশ হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভয়টা ঐ দেশকে নিয়ে। সুতরাং দক্ষিণ চীন সাগরে তার উপস্থিতি প্রয়োজন রয়েছে।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

- যুক্তরাষ্ট্রের এ অঞ্চলে সম্পৃক্ততার অন্য আরেকটি কারণ হচ্ছে ভূ-কৌশলগত। এ সাগর দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র তার নৌবাহিনীকে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করাতে পারে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি সামরিক কৌশলগত জলসীমা হিসেবে বিবেচিত। যুক্তরাষ্ট্র ২০২০ সালের মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ৬০ ভাগ সামরিক উপস্থিতি বৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছে। সুতরাং তার সেই উদ্দেশ্য সফল করার জন্যই এ নৌপথকে নিরাপদ রাখতে হবে। চীনকে চারপাশ থেকে সামরিক শক্তির মাধ্যমে ঘিরে ফেলার উদ্দেশ্যে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। এটা যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটেজির অপর একটি অংশ। এ জন্যই দক্ষিণ চীন সাগরের গুরুত্ব অনেক।
- চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্রের কাছে দক্ষিণ চীন সাগর একটি গুরুত্বপূর্ণ জলসীমা, কারণ হলো এ সাগর দিয়ে বিশ্ববাণিজ্যের মোট ৩২ শতাংশ প্রবাহিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জাপান, কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, পূর্ব এশিয়ায় যাওয়ার বাণিজ্যিক রুট হিসেবে এ পথকে ব্যবহার করা হয়। এ সাগরে এক হাজার নটিক্যাল মাইল সমুদ্রসীমা চীন নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার পরিকল্পনা করেছে, যা মূলত তার মূলভূমি থেকে প্রায় ১ হাজার নটিক্যাল মাইল দূরে।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

জাপানের কাছে এর গুরুত্ব হলো, দেশটি এ জলপথকে ব্যবহার করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানি করে এবং ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্যিক রুট হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। দক্ষিণ চীন সাগরের বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলো নিয়ে চীন-জাপান দীর্ঘদিন থেকেই বিরোধে লিপ্ত। জাপান দ্বীপগুলোকে নাম দিয়েছে সেনকাকু এবং চীনের কাছে এগুলো দিয়াওইউ নামে পরিচিত। বিরোধপূর্ণ দ্বীপ এবং কিছু অমীমাংসিত বিষয় নিয়ে এ দুই আঞ্চলিক শক্তির দ্বন্দ্ব এ অঞ্চলের রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে রেখেছে। দেশ দুটির অর্থনীতি এবং সামরিক বাহিনী বিশাল। বিশ্ব রাজনীতির ধারাবাহিকতায় চীন এবং জাপান কখনোই সমান ছিল না, সর্বদা একজন অন্যজনের ওপর প্রভাব বিস্তার ও শাসন করার চেষ্টা করেছে। এশিয়ার অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ জাপানের নিজস্ব তেল বা গ্যাস নেই। তাই শক্তির চাহিদা মেটাতে জাপানকে এগুলো আমদানি করতে হয়। জাপান এগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমুদ্রপথে আমদানি করে থাকে। এই পথে জাপান দৈনিক ১০ মিলিয়ন ব্যারেল তেল আমদানি করে থাকে। মূলত এজন্যই এ সমুদ্রপথটি জাপানের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দক্ষিণ চীন সাগর সংকট

- দক্ষিণ চীন সাগর দ্বন্দ্ব আমাদেরকে থুকিডাইডিস ফাঁদ তত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রিক ঐতিহাসিক থুকিডাইডিস (460-400)-এর তত্ত্বই থুকিডাইডিসের ফাঁদ তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মূলকথা হলো- বড় শক্তির সঙ্গে উদীয়মান শক্তির সংঘাত অনিবার্য। দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের দ্বন্দ্ব এই তত্ত্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ধীরগতির বছরেও চীন সামরিক ব্যয় ১০ শতাংশ বাড়িয়েছে। দেশটির এক জেনারেল বলেছেন, “চীন স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠলে কোনো শত্রু তাকে ভয় দেখাতে পারবে না।” ২০১৯ সালেও দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে কোনো ছাড় না দেওয়ার অবস্থানেই ছিলো চীন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গ্রাহাম অ্যালিসন গত ৫০০০ বছরে ঘটা বিবাদ থুকিডাইডিস ফাঁদ-এর মাধ্যমে ১৬টি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেছেন। এর মধ্যে ১২টি ক্ষেত্রেই যুদ্ধ হয়েছে। অ্যালিসনের বিশ্লেষণ, উভয় পক্ষ যখন মনোভাব ও কর্মকাণ্ডে বড় ধরনের ছাড় দিয়েছে, তখনই কেবল যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

দক্ষিণ চীন সাগরের অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বিভিন্ন উপাদান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনীতির ময়দানে গরম হাওয়া জুড়ে দিয়েছে, তা স্পষ্টই বলা যায়। দক্ষিণ চীন সাগরের এই দ্বন্দ্ব কেবল ভূ-খণ্ডগত বিরোধে সীমাবদ্ধ না থেকে ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের পথেও অগ্রসর হতে পারে।

STRING OF PEARLS

দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে চীনের মুক্তার মালা বা String of Pearls- এর নীতি নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। এই মুক্তার মালা নীতির আলোকে চীন ভারত মহাসাগর ঘেঁষা কয়েকটি সামুদ্রিক বন্দরকে মূল ভূ-খণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে, যেখানে চীনা জাহাজের রিফুয়েলিং এবং অবস্থান নিশ্চিত হবে। এই মুক্তার মালায় ২টি দ্বীপ ও ১৫টি সামুদ্রিক বন্দরকে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই বন্দরগুলো একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত থাকবে, অনেকটা মুক্তার মালার মতো। আর এ কারণেই এর নামকরণ করা হয়েছে ‘মুক্তার মালা’ (String of Pearls)। বন্দরগুলো হচ্ছে, হংকং, সানইয়া, হাইনান (চীন), উডি (Woody) প্যারাসেল দ্বীপপুঞ্জ, Spratly দ্বীপপুঞ্জ, সিহানুকভিলে ও রিয়াম (Sihanouk Ville, Ream-কম্বোডিয়া), দি ক্রা (De Kra-থাইল্যান্ড), কোকো ও কিয়াও কিপিউ-সিটওয়ে (Kyaoukpya Sittwe-মিয়ানমার) চট্টগ্রাম (বাংলাদেশ), হাম্বানটোটা (Hambantota-শ্রীলঙ্কা), মারাও (Marao-মালদ্বীপ), গোয়াদর (Gwader-পাকিস্তান), আল আহদাব (ইরাক), লামু (Lamu-কেনিয়া), পোর্ট সুদান (Port Sudan-সুদান)। যদি ভারত মহাসাগরের ম্যাপের দিকে তাকানো হয়, তাহলে দেখা যাবে চীন থেকে শুরু হয়ে এই মুক্তার মালা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া অতিক্রম করে সুদানে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই মুক্তার মালার সমুদ্রপথ চীনের জ্বালানি আমদানির অন্যতম রুটও বটে।

STRING OF PEARLS

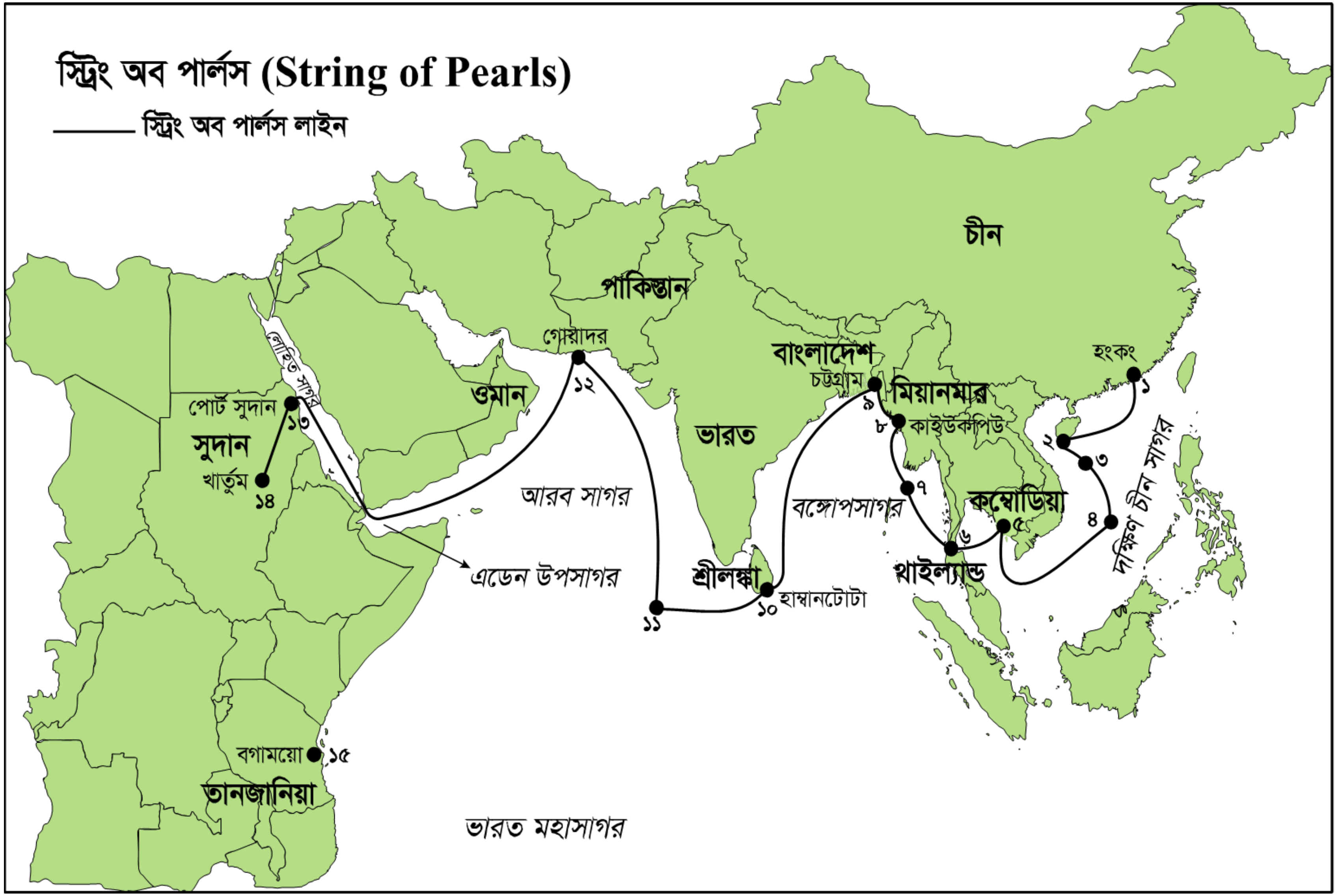
স্ট্রিং অব পার্লস (String of Pearls)
স্ট্রিং অব পার্লস লাইন
চীন
পাকিস্তান
গোয়াদর
১২
ওমান
লোহিত সাগর
পোর্ট সুদান
১৩
সুদান
খার্তুম
১৪
আরব সাগর
এডেন উপসাগর
ভারত
বাংলাদেশ
চট্টগ্রাম
৯
মিয়ানমার
৮
কাইউকপিউ
৭
বঙ্গোপসাগর
শ্রীলঙ্কা
১০
হাম্বানটোটা
১১
হংকং
১
২
৩
৪
দক্ষিণ চীন সাগর
কম্বোডিয়া
৫
৬
থাইল্যান্ড
বগামোয়ো
১৫
তানজানিয়া
ভারত মহাসাগর

নিউ সিল্ক রোড নীতি

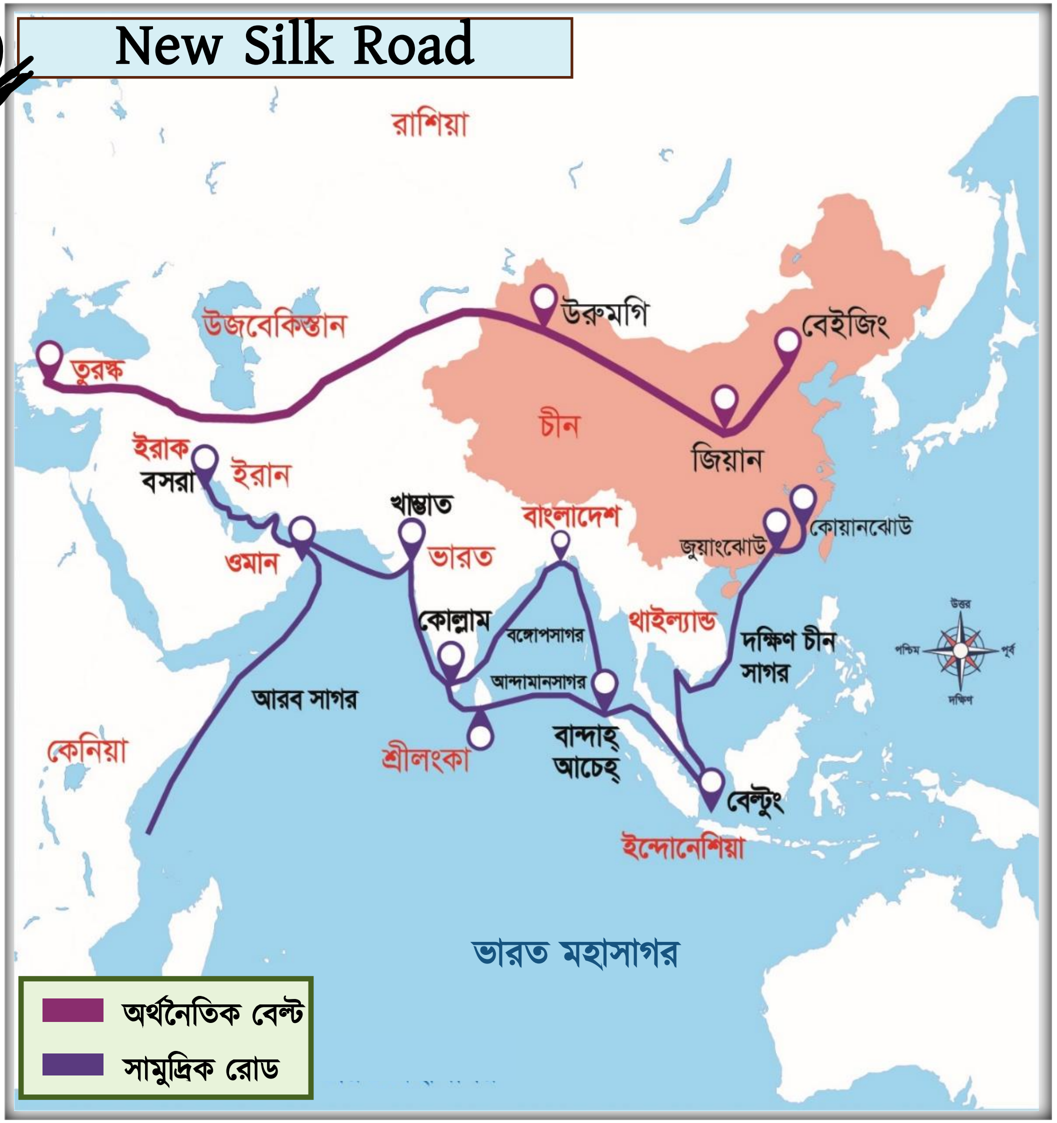
New Silk Road
রাশিয়া
উরুমগি
বেইজিং
উজবেকিস্তান
তুরস্ক
চীন
জিয়ান
ইরাক
বসরা
ইরান
খাম্ভাত
বাংলাদেশ
কোয়ানঝোউ
জুয়াংঝোউ
ওমান
ভারত
কোল্লাম
বঙ্গোপসাগর
থাইল্যান্ড
দক্ষিণ চীন সাগর
আন্দামানসাগর
আরব সাগর
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
কেনিয়া
শ্রীলংকা
বান্দাহ্ আচেহ্
বেল্টুং
ইন্দোনেশিয়া
ভারত মহাসাগর
অর্থনৈতিক বেল্ট
সামুদ্রিক রোড

ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি

৬.১৫ কি.মি

জাজিরা। শরীয়তপুর

মাওয়া। মুন্সীগঞ্জ

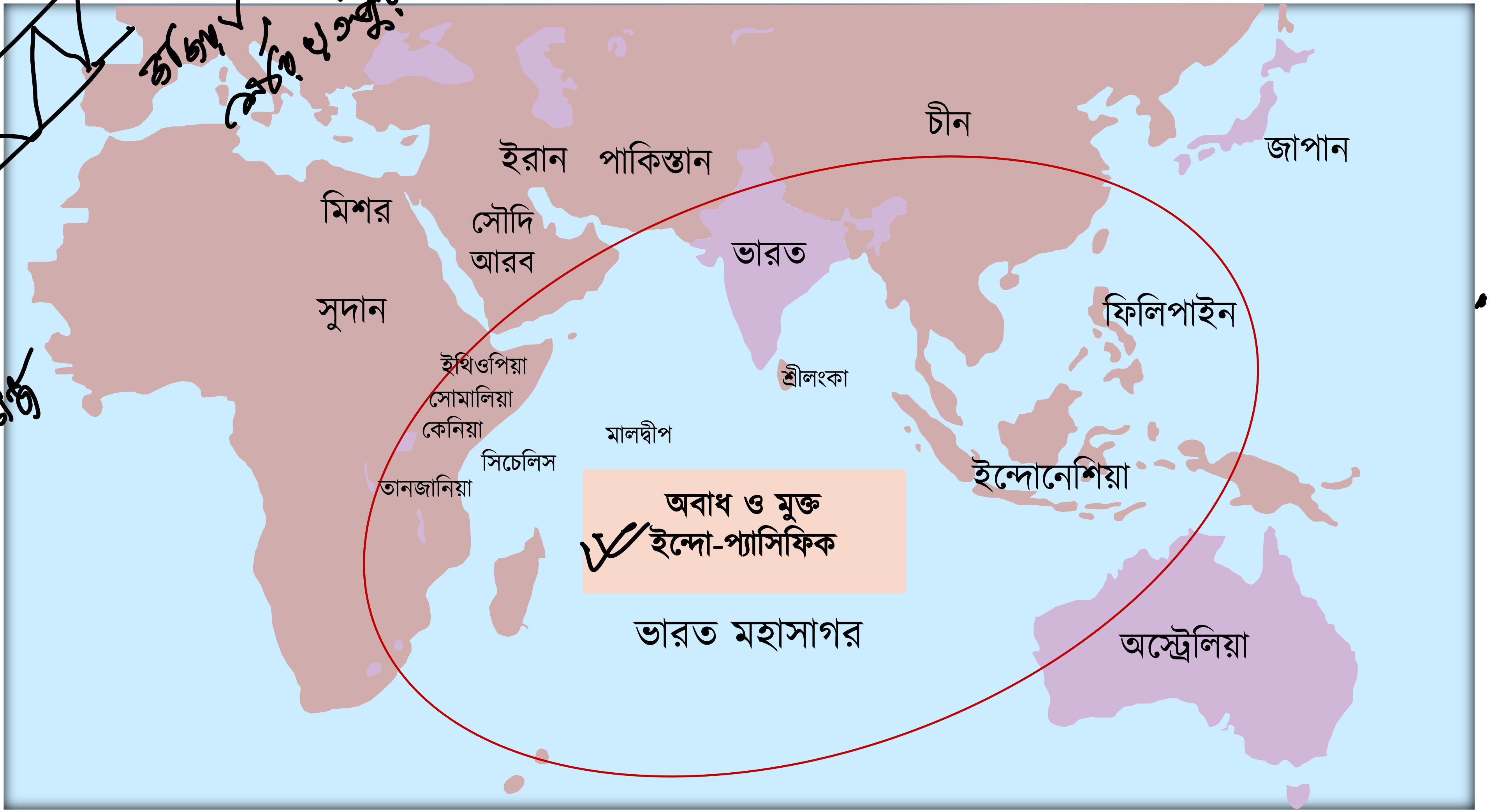
চীন
জাপান
ইরান
পাকিস্তান
মিশর
সৌদি আরব
ভারত
সুদান
ফিলিপাইন
ইথিওপিয়া
শ্রীলংকা
সোমালিয়া
কেনিয়া
মালদ্বীপ
সিচেলিস
ইন্দোনেশিয়া
তানজানিয়া
অবাধ ও মুক্ত
✓ ইন্দো-প্যাসিফিক
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া

বাংলাদেশ ও ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ✪ যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার চলমান বাণিজ্য যুদ্ধ আন্তর্জাতিক বাজারে ও বিশ্ব অর্থনীতিতে কী ধরনের প্রভাব ফেলছে বিস্তারিত লিখুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ✪ চীন ও ভারতের সম্পর্ক নিয়ে একটি রচনা লিখুন। এই দুটি রাষ্ট্রের সম্পর্কের গতি প্রকৃতি এশিয়ায় বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় কী প্রভাব রাখছে তা পর্যালোচনা করুন। [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- ✪ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকগুলো সাম্প্রতিক সময়ের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। [৩৪তম বিসিএস লিখিত]
- ✪ দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির গুরুত্ব ও প্রভাব কী? ওবামা প্রশাসনের আফগাননীতি পর্যালোচনা করুন। [৩০তম বিসিএস লিখিত]
- ✪ যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট Barak Obama-র প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবেন বলে আপনি মনে করেন? বিস্তারিত আলোচনা করুন। [২৮তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

৪৫তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০৭

টপিক: আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ: বড় অর্জন, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা (১৯৭১-২০২১), বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি, সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি), উন্নয়নশীল দেশগুলোর LDC থেকে উত্তরণ।

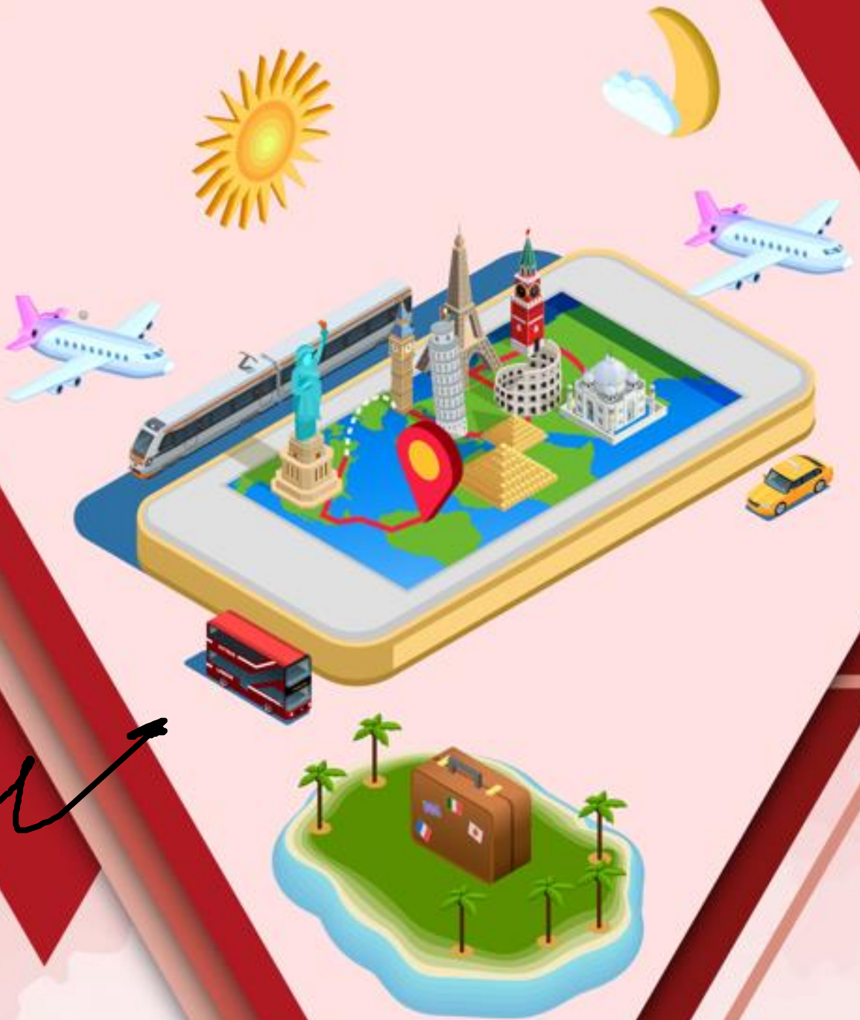

বাংলাদেশের বড় অর্জন

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী একটি বিধ্বস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবকাঠামো বিনির্মাণ ছিল সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। পরবর্তীতে বাংলাদেশের জনগণের অক্লান্ত পরিশ্রম, কঠোর সাধনা এবং সরকার প্রধানদের নিরলস প্রচেষ্টার ফলে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ একটি শক্তিশালী অর্থনীতির ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে। যদিও যে মাত্রায় উন্নয়ন কাম্য ছিল সেই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রায় উন্নয়ন অর্জিত হয়নি। তারপরও বিদেশি শাসক শ্রেণির নির্যাতন নিপীড়নে বিধ্বস্ত এ দেশ আজ যে পর্যায় এসে দাঁড়িয়েছে সেটিও কম নয়। কেবল অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দেশিয় কাজেই নয়, বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থানেও নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়েছে এবং বিশ্বের অনেক দেশের মধ্যে লড়াই করে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের দেশের নাম বিশ্ব মানচিত্রে স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল করেছে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

❖ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ

দেশিয় গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলেও নানাবিধ সাফল্য অর্জন করেছে। বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বাংলাদেশ সভাপতিত্ব এবং নেতৃত্বও দিচ্ছে। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বর্তমান অর্জনসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রবেশ :** জাতিসংঘ ১৯৭১ সালে এলডিসি ক্যাটাগরি চালু করে। জাতিসংঘের এলডিসি তালিকাভুক্ত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের শর্ত হলো ৩টি। যথা

ক. মানব সম্পদ সূচক (৬৬ বা এর বেশি পয়েন্ট);
খ. মাথাপিছু আয় সূচক (১২৩০ মার্কিন ডলার বা এর বেশি অর্জন);
গ. অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা (৩২ শতাংশের নিচে থাকা)।

বাংলাদেশ প্রথম স্বল্পোন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৫ সালে। ১ জুলাই, ২০১৫ সালে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকাভুক্ত করে। ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বের হওয়ার জন্য জাতিসংঘের এলডিসি ক্যাটাগরির ৩টি শর্ত অর্জন করে (মানবসম্পদ সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ৭২.৮ পয়েন্ট, অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ২৪.৮ পয়েন্ট আর মাথাপিছু আয় সূচকে বাংলাদেশের অর্জন ১২৭২ মার্কিন ডলার)।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- ১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) তার ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেয়। তবে শর্ত ছিল এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে সূচকের একই ধারা বজায় রাখতে হবে ২০২১ সাল পর্যন্ত। বাংলাদেশ ২০২১ সালে তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। তাই বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে চূড়ান্ত উত্তরণের সুপারিশ দেয় সিডিপি।
- একই ধারা বজায় থাকলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ার কথা। তবে করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশ বাড়তি অরও দুই বছর সময় পায়। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হবে বাংলাদেশ। ২০২৬ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হলেও নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী ৩ বছর পর্যবেক্ষণে থাকতে হবে।
- উন্নয়নশীল দেশের কাতারে গেলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে জিএসপি সুবিধা পায় তা ২০২৯ সাল পর্যন্ত বহাল থাকবে। পরবর্তীতে শুল্কমুক্ত সুবিধা পেতে বাংলাদেশকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার কাছে আবেদন করতে হবে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

২. স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন : বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তাঁর বর্তমান অবস্থানকে জানান দিল স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপনের মধ্যদিয়ে। এই অর্জন বাংলাদেশকে বিশ্ব মানচিত্রে এক অসামান্য প্রতিভার অধিকারী দেশ বলেই প্রতীয়মান করলো। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষের অনুষ্ঠানে যোগদান করা বিশ্ব নেতৃবৃন্দের বক্তব্যেও বাংলাদেশের এ অর্জনের ভূয়সি প্রশংসা দেখতে পাওয়া যায়।

জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেস স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও মুজিববর্ষের অনুষ্ঠানে দেওয়া তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন, "সংগ্রমের মধ্য দিয়ে ৫০ বছর আগে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবদান রেখে চলেছে। সেই সঙ্গে গত পাঁচ দশকে সামাজিক উন্নয়ন ও দুর্যোগ মোকাবিলায় অসাধারণ ভূমিকা রেখে আসছে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ, জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামে অংশীদারত্ব এবং মিয়ানমার থেকে আসা লাখ লাখ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বে মানবিকতার নজির তৈরি করেছে বাংলাদেশ।"

বাংলাদেশের বড় অর্জন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন লিখিত বার্তায় বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতি সম্মান জানিয়ে বাংলাদেশের মানুষের অসাধারণ অর্জনের জন্য অভিবাদন জানান। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের এক দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে। মানবিক ও উদারতার উদাহরণ তৈরি করেছে দেশটি। ১০ লাখ বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে মানবাধিকারের এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। অন্যান্য দেশের মানুষের জন্য বাংলাদেশের অর্জন হবে শিক্ষণীয় ও অনুপ্রেরণার উৎস।"

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন ভিডিও বার্তার মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বে দ্রুত ক্রমবর্ধমান অর্থনীতির দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য আরও সমৃদ্ধ ও পরিবেশগত টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করবে।

অন্যদিকে, **বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন বলেছেন,** "পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশের অর্জন অনেক। দারিদ্র্য বিমোচনে বিশ্বের সাফল্যজনক দেশের নাম বাংলাদেশ।“

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৩. জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন : সবচেয়ে আনন্দের ও গর্বের বিষয় হচ্ছে শুধু বাংলাদেশ নয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এবং সংস্থাও মুজিব শতবর্ষ উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো ৪০তম সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে যৌথভাবে মুজিববর্ষ পালনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে বিশ্বের ১৯৩টি দেশে উদযাপিত হচ্ছে মুজিববর্ষ। তাছাড়া ইউনেস্কো মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে বঙ্গবন্ধুর নামে একটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রবর্তনেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গবেষণা, সৃজনশীলতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিকাশে তরুণদের উৎসাহিত করতে প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর এ পুরস্কার প্রদান করবে সংস্থাটি। তাই জাতির জনকের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের মধ্যদিয়ে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর ইতিহাস ও গৌরব মূল্যায়নের সুযোগ লাভ করলো।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৪. জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচার : আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের জন্য কলঙ্কজনক অধ্যায় ছিল বাঙালি জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য সম্পন্ন করতে না পারা। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তা করতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক কলঙ্কের দাগ মোচন করতে সক্ষম হলো। জাতির জনকের হত্যাকাণ্ডের বিচারকার্য করতে পারা প্রমাণ করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের কূটনৈতিক শক্তির সক্ষমতা। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের বিচার বিঘ্নিত করার জন্য অনেক আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ তা সম্পন্ন করে নিজের অস্তিত্ব বিশ্ব অঙ্গনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বাকি খুনিদের ফিরিয়ে আনতেও জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৫. যুদ্ধাপরাধীদের বিচার : বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সবচেয়ে বড় অর্জন জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করা অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্যক্রম শুরু করা। ১৯৭১ এর মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালে ১৯ নং আইন দ্বারা আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) গঠন করা হয়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য দুটি ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। প্রথম ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২৫ মার্চ, ২০১০ এবং দ্বিতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয় ২২ মার্চ, ২০১২। চূড়ান্ত বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর এ পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে ৬ জনের। মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনাল জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত মোট রায় প্রদান করেছে ৪১টি। যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর সক্ষমতা ও আইন ব্যবস্থার উন্নয়ন তুলে ধরতে সক্ষম হলো।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৬. সমুদ্র বিজয় : গঙ্গা আর ব্রহ্মপুত্র যেখানে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে সেখানেই কালের পরিক্রমায় গড়ে ওঠা পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ বাংলাদেশ। ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ার ভারত ও মিয়ানমারের মাঝখানে। সমুদ্রসীমা নিয়ে বাংলাদেশের বিরোধ ছিল দুই দেশের সঙ্গে (ভারত ও মিয়ানমার)। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্র সীমা বিরোধ মামলার রায় জয় ১৪ মার্চ, ২০১২ সালে। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সমুদ্রসীমা বিরোধ নিরসনে রায় দেয় জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত সমুদ্র বিষয়ক আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল ITLOS (International Tribunal for the Law of the Sea)। এই রায়ে বাংলাদেশ-মিয়ানমার বিরোধপূর্ণ সমুদ্রসীমার মধ্যে বাংলাদেশ লাভ করে ১,১১,০০০ বর্গ কি. মি.। বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মামলার রায় হয় ৭ জুলাই, ২০১৪ সালে। বাংলাদেশ-ভারত সমুদ্রসীমা নিষ্পত্তি মামলার রায় দেয় নেদারল্যান্ডের হেগ শহরে অবস্থিত স্থায়ী সালিশি আদালত PCA (Permanent Court of Arbitration)। এই রায়ে বাংলাদেশ-ভারত বিরোধপূর্ণ সমুদ্র এলাকার মধ্যে বাংলাদেশ পায় ১৯,৪৬৭ বর্গ কি. মি. আর ভারত পায় ৬,১৩৫ বর্গ কি.মি.। তবে বিরোধপূর্ণ দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টী পায় ভারত। বর্তমানে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার দৈর্ঘ্য ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি.মি.।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৭. ছিটমহল বিনিময় ও সীমান্ত চুক্তি বাস্তবায়ন : বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে। ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্বাক্ষরিত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পক্ষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর ভারতের পক্ষে ইন্দিরা গান্ধী। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তির বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশ ভারতকে বেরুবাড়ী হস্তান্তর করবে এবং ভারত বিনিময়ে বাংলাদেশকে তিন বিঘা করিডোর ছেড়ে দেবে। বাংলাদেশ সরকার ২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪ সালে সংবিধানের তৃতীয় সংশোধনী দ্বারা তা স্বীকৃতি দিলেও ভারত সরকার স্বীকৃতি দেয়নি। আর এই সমস্যার সমাধান হয় ১ আগস্ট, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ-ভারত ছিটমহল বিনিময় চুক্তি কার্যকর হওয়ার মধ্য দিয়ে। বাংলাদেশে ভারতের ছিটমহল ছিল ১১১টি আর ভারতে বাংলাদেশের ছিটমহল ছিল ৫১টি। ছিটমহল বিনিময়ের ফলে বাংলাদেশ ১৭,০০০ একর জমি লাভ করে আর ভারত পায় ৭,৫০০ একর জমি। বর্তমানে ৬.৫ কি, মি. জমির সীমানা এখনো অচিহ্নিত রয়েছে। ছিটমহল বিনিময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের অন্যতম বড় একটি অর্জনও বলা যায়।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৮. নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ : বাংলাদেশ ২০০৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট নিয়ে কাজ শুরু করে। বাংলাদেশের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ ‘বঙ্গবন্ধু-১' স্যাটেলাইটটি যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা রাজ্যের অকল্যান্ডের কেনেডি স্পেস সেন্টারের কেপ কেনাভেরাল থেকে উৎক্ষেপণ করা হয় (স্থানীয় সময় ১১ মে, ২০১৮; বাংলাদেশ সময় ১২ মে, ২০১৮; ভোর ২ : ১৪ মিনিট)। এটি বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে ১৯ মে, ২০১৯। স্যাটেলাইটটির মেয়াদকাল ১৫ বছর (স্থায়ীত্ব প্রায় ১৮ বছর)। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটির পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে ৯ নভেম্বর, ২০১৮। বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ফ্রান্সের থেলেস এলেনিয়া স্পেস। স্যাটেলাইটটি নির্মিত হয় ফ্রান্সের কান টুলুজ ফ্যাসিলিতে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের মোট ট্রান্সপন্ডার ৪০টি এবং ওজন ৩.৭ টন। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটটি বহনকারী রকেট ফ্যালকুন-৯। গাজীপুরের জয়দেবপুর এবং রাঙামাটির বেতবুনিয়া উপগ্রহ কেন্দ্রে এই স্যাটেলাইটের দুইটি গ্রাউন্ড স্টেশন রয়েছে। বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের আগে তা স্থাপনের জন্য কক্ষপথ বা অরবিটাল স্লট ক্রয় করেছিল ২০১৩ সালে রাশিয়ার ইন্টারস্পুটনিকের কাছ থেকে। এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ তাঁর সরব উপস্থিতি প্রমাণ করলো।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

৯. সাবমেরিন যুগে বাংলাদেশ : বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করে ১২ মার্চ, ২০১৭ সালে। ৪১তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ 'নবযাত্রা’ ও 'জয়যাত্রা’ নামে দুইটি সাবমেরিন নৌবাহিনীতে যুক্ত করার মধ্যদিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে নিজের নাম লেখাতে সক্ষম হয়। তবে বাংলাদেশ প্রথম সাবমেরিন ক্যাবল নেটওয়ার্ক SEA ME-WE-4 এ যুক্ত হয় ২১ মে, ২০০৬ সালে। বাংলাদেশে SEA-ME-WE-4 এর ল্যান্ডিং স্টেশন রয়েছে কক্সবাজারের ঝিলংমে। বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিন ক্যাবল SEA-ME-WE-5 এ যুক্ত হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ সালে। দ্বিতীয় সাবমেরিন এর দৈর্ঘ্য ২০,০০০ কি.মি. এবং এর ল্যান্ডিং স্টেশন অবস্থিত পটুয়াখালীর কুয়াকাটায়। সাবমেরিন যুগে প্রবেশের মধ্যদিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ নতুন মাত্রা যোগ করলো।

১০. MDG (Millennium Development Goals) অর্জনে সাফল্য : ২০০০ সালে ঘোষিত MDG তে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির ৮টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৮টি উদ্দেশ্য পূরণে জাতিসংঘের ১৮৯টি সদস্য দেশ একমত হয়। MDG গৃহীত হয় ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০০; মেয়াদকাল ছিল ২০০১ থেকে ২০১৫। তাই মেয়াদকাল শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ সালে। এটি জাতিসংঘের ৫৫তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। লক্ষ্যগুলো অর্জনে ইতোমধ্যে ৯টি সূচক অর্জন করেছে বাংলাদেশ আরও ১০টি সূচকে অর্জন লক্ষ্য মাত্রার কাছাকাছি অবস্থান করছে। MDG অর্জনে সাফল্য লাভের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেছে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- ✓ দারিদ্র্যের ব্যবধান অনুপাত ২০১৫ সালে ৮ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও তারপূর্বেই বাংলাদেশ তা ৬.৫ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

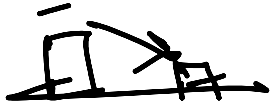

- ✓ শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার জন্য এমডিজি-৪ অর্জনে এগিয়ে থাকায় বাংলাদেশকে ইউনিসেফ কর্তৃক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যমাত্রার MDG-২ এর ক্ষেত্রে ২০১১ সালের মধ্যেই ৯৫ শতাংশ শিশুকে প্রাইমারী স্কুলে পাঠানোর লক্ষ্য অর্জন করেছে বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ মানবসূচক উন্নয়নে ০.৫২৪ সূচক অর্জন করে ১৭৯টি দেশের মধ্যে ১৩৯তম স্থান অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ এখন আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির রোল মডেল। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সফলতা অর্জন এবং স্বাস্থ্য খাতে গুণগত মান উন্নয়নে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করায় আন্তর্জাতিক টেলিকমিউনিকেশন, সাউথ সাউথ নিউজ ও জাতিসংঘের আফ্রিকা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কমিশন যৌথভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে সাউথ সাউথ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

~~১.~~ SDG (Sustainable Development Goals) গ্রহণ

SDG গৃহীত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এবং এর মেয়াদকাল ২০১৬-২০৩০ সাল পর্যন্ত। এটি বাস্তবায়ন শুরু হয় ১ জানুয়ারি, ২০১৬ এবং মেয়াদকাল শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর, ২০৩০। SDG-এর রোডম্যাপ সর্বসম্মতভাবে গ্রহণ করে ১৯৩টি দেশ। এটি জাতিসংঘের ৭০তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। SDG-এর অভীষ্ট লক্ষ্য ১৭টি, টার্গেট ১৬৯টি এবং সূচক ২৪১টি। SDG-তে বাংলাদেশের প্রস্তাব ছিল ১৯টি, যার মধ্যে গৃহীত হয় ১৫টি। SDG-এর মূল বক্তব্য “কাউকে বাদ দিয়ে নয়, কাউকে পিছনে ফেলে নয়।” SDG এর লক্ষ্য-১ হলো দারিদ্র্য বিমোচন এবং লক্ষ্য-১৭ হলো টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারিত্ব। বাংলাদেশ SDG গ্রহণের মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুনভাবে নিজেকে উপস্থাপনের অধিকার লাভ করলো।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

১২. জাতিসংঘে বাংলাদেশ : ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ১৩৬তম সদস্য দেশ হিসেবে জাতিসংঘের (২৯তম সাধারণ অধিবেশনে) সদস্য পদ লাভ করে। সদস্য পদ লাভের পর ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতিসংঘে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দেন। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হয় ১৯৮৬ সালে (৪১তম অধিবেশনে)। এই অধিবেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। বাংলাদেশ জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদ লাভ করে ২ বার। ১ম বার নির্বাচিত হয় ১০ নভেম্বর, ১৯৭৮ সালে (১৯৭৯-১৯৮০ মেয়াদে) এবং ২য় বার নির্বাচিত হয় ১৪ অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে (২০০০-২০০১ মেয়াদে)। এছাড়াও বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি পদ লাভ করে ২০০১ সালে। এই মেয়াদে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আনোয়ারুল করিম চৌধুরী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন সৈয়দ আনোয়ারুল করিম (এস এ করিম) এবং বর্তমানে স্থায়ী প্রতিনিধি হলেন রাবাব ফাতেমা (১৪তম স্থায়ী প্রতিনিধি, দ্বিতীয় নারী প্রতিনিধি)। জাতিসংঘে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে আন্ডার সেক্রেটারি নিযুক্ত হন আমিরাহ হক এবং প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্থায়ী সালিশি আদালতের বিচারক হন বিচারপতি মোঃ তফাজ্জল ইসলাম ও বিচারপতি আওলাদ আলী। জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রদেয় বার্ষিক চাঁদার হার ০.০১ শতাংশ। জাতিসংঘে দ্বিতীয় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাংলায় ভাষণ দেন শেখ হাসিনা।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

১৩. জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ : ১৯৪৮ সাল থেকে জাতিসংঘ শান্তি মিশনের কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতিসংঘ ইরাক-ইরান সামরিক পর্যবেক্ষণ গ্রুপ (UNIIMOG) অপারেশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম জাতিসংঘ শান্তি মিশনে অংশ নেয়। জাতিসংঘ শান্তিমিশনে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কর্মরত আছে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। ১৯৮৯ সালে নামিবিয়ার শান্তি মিশনে (UNTAG) বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনী সর্বপ্রথম অংশ নেয়। ২৫ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৫ জন সদস্য বেনিনে বিমান দুর্ঘটনায় শহিদ হন। শেরে বাংলানগরে জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে নিহতদের স্মরণে স্মৃতি স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে। এসপি মিলি বিশ্বাস প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নেতৃত্ব দেন। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত মোট ৪৪টি দেশে ৫৪টি শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। বর্তমানে ৯টি দেশে ১৩টি শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী কর্মরত আছে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

১৪. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় নেতৃত্ব : বাংলাদেশ বর্তমানে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনের নেতৃত্ব দিয়েছেন বা দিচ্ছেন। যেমন:

➲ **One Health Global Leaders Group Antimicrobial Resistance-এর কো চেয়ারম্যান :** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা WHO, FAO ও OIF কর্তৃক ২০২১-২০২২ (দুই বছর) সালের জন্য One Health Global Leaders Group Antimicrobial Resistance-এর কো-চেয়ারম্যান মনোনীত হন।

➲ **বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিন সংস্থার সদস্য নির্বাচিত :** সর্বোচ্চ ভোটে বিজয়ী হয়ে বাংলাদেশ জাতিসংঘের তিনটি অঙ্গ সংস্থা UNDP, UNFPA ও UNOPS নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয় (২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২০)। ২০২১ সালের ১ জানুয়ারি (২০২১-২৩) মেয়াদে বাংলাদেশ নির্বাহী বোর্ডের সদস্যের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

➲ **জাতিসংঘের WSIS পুরস্কার লাভ :** তথ্য প্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক পুরস্কার ‘World Summit on Information Society’ পুরস্কার, ২০২০ লাভ করে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (BCC)।

বাংলাদেশের বড় অর্জন

- **CFC এর এমডি পদে বাংলাদেশ :** জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় পরিচালিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউট দ্য কমন ফান্ড ফর কমডিটিজের (CFC) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে জয়লাভ করে বাংলাদেশ। ৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ সুইজারল্যান্ডের হেগে CFC এর গভর্নিং কাউন্সিলের ৩১তম বার্ষিক সভায় নেদারল্যান্ডসে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত শেখ মুহম্মদ বেলাল আগামী চার বছরের জন্য CFC এর এমডি পদে নির্বাচিত হন।
- **প্রধানমন্ত্রীর দুই পদক লাভ :** জাতিসংঘের ৭৪তম অধিবেশনে যোগদান সফরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মর্যাদাসম্পন্ন দুইটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভ করেন। যথা:
  ১. বাংলাদেশের শিশুদের টিকাদান কর্মসূচিতে সাফল্যের জন্য গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ভ্যাক্সিনস অ্যান্ড ইমিউনাইজেশন (জি-এভিআই) কর্তৃক ‘ভ্যাকসিন হিরো-২০১৯' সম্মাননা।
  ২. বাংলাদেশের তরুণদের দক্ষতা উন্নয়নে অসামান্য সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ 'চ্যাম্পিয়ন অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর ইয়ুথ পুরস্কার ২০১৯।
- **মেডেল অব ডিসটিংকশন :** দরিদ্র, অসহায়, বিশেষ করে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আশ্রয়দান ও বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২৮ মার্চ, ২০১৮ ‘মেডেল অব ডিসটিংকশন’ সম্মানে ভূষিত করেন লায়ন্স ক্লাব ইন্টারন্যাশনাল।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ এবং নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে আমাদেরকে বহির্বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্র এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়। ফলে আমাদের যত অর্জন ঠিক তেমনি তত বেশি চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হয়। নিচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ আলোচনা করা হলো :

- করোনার থাবায় আজ বিশ্ব নাজেহাল হয়ে পড়েছে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রয়েছে। অধিক জনসংখ্যার এই দেশটি বেশি আক্রান্ত হলে তা মহামারিতে রূপ নিতে পারে। তাই বাংলাদেশের সামনে এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো কোভিড-১৯ মোকাবিলা করা। বৈশ্বিক এই মহামারির হাত থেকে বাংলাদেশকে নিরাপদ রাখাই এখন বাংলাদেশের জন্য বড় মাপের আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ।
- ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রবেশ করেছে। ফলে পূর্বের অনেক সুবিধা হয়তোবা বাংলাদেশকে বিসর্জন দিতে হবে। থাকবে না কোটা ও শুল্ক সুবিধা। তাই উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের ফলে যে সকল সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশকে মোকাবিলা করতে হবে তার জন্য প্রস্তুত থাকা।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

- করোনা মহামারির কারণে বাংলাদেশের অন্যতম আয়ের উৎস জনশক্তি রপ্তানিতে ভাটা পড়ছে। তাই জনশক্তি রপ্তানির প্রবাহ ধরে রাখা বাংলাদেশের সামনে একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণেই। করোনাকালীন মুহূর্তেও বাংলাদেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ কিছুটা হলেও স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু করোনা পরবর্তী ধাক্কায় বড় ধরনের বাঁধা আসতে পারে। তাই রেমিট্যান্স প্রবাহ স্বাভাবিক রাখাও বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- সমুদ্র বিজয়ের ফলে বাংলাদেশের সামনে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনার বড় দুয়ার উন্মোচিত হয়েছে। কিন্তু তা কাজে লাগানোর জন্য বাংলাদেশের প্রয়োজন আরো দক্ষতা অর্জন। তাই সুনীল অর্থনীতিকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং এক্ষেত্রে সম্ভাব্য প্রতিবন্ধকতাও বাংলাদেশের জন্য এক ধরনের চ্যালেঞ্জ।
- পানি বণ্টন সমস্যা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়। তাই পানি বণ্টন ও পানি প্রবাহ স্বাভাবিক রাখা এখন বাংলাদেশের জন্য এক প্রকার চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যে কোয়াড, ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি, ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড প্রভৃতি বৈশ্বিক রাজনীতি ও জোট মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব জোটে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য চাপও প্রয়োগ করা হচ্ছে। তাই এসব বৈশ্বিক কূটনীতি মোকাবিলা করা বর্তমানে বাংলাদেশের সামনে এক ধরনের চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

- সম্প্রতি মিয়ানমারের রাখাইন প্রদেশে বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত দাঙ্গায় আবারও জীবন্ত হয়ে ওঠে রোহিঙ্গা ইস্যু। এর ভুক্তভোগী আমাদের বাংলাদেশও। ইতোমধ্যে শরণার্থী হয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে ১১ লাখের অধিক রোহিঙ্গা। সম্প্রতি সংঘাতে আরো আসার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এটি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে স্বল্প আয়তনের বাংলাদেশের জন্য।
- ২৯-৩০সেপ্টেম্বর, ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামুতে কয়েকটি বৌদ্ধ প্যাগোডায় রাতের অন্ধকারে কিছু সুবিধাভোগী গোষ্ঠী ব্যাপক অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ছড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। ফলে বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বমঞ্চে জঙ্গি শব্দটি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এটিও একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়েছে।
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে উপর্যুপরি দুইটি সমুদ্রসীমা বিষয়ক মামলায় বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত জয় অর্জিত হওয়ায় এখন সেখানে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়িয়েছে বাংলাদেশের সামনে।
- প্রতিবেশী ভারতের সাথে সীমান্ত সমস্যা দূরীকরণ, তিস্তার পানিচুক্তি, ভারত-যুক্তরাষ্ট্রসহ সকল দেশে পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার, মহীসোপানের সকল প্রাণিজ ও খনিজ সম্পদের ওপর বাংলাদেশের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জসমূহ

➲ নারীর ক্ষমতায়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, দেশিয় গোলযোগ দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিশ্বপরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সুনাম অর্জন, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে উপনীত হয়েছে।

➲ মিয়ানমারের সাথে বর্তমানে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভালো। তবে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশের হাতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নায়েক সুবাদার মিজানুর রহমানের মৃত্যুর পর সম্পর্কের বেশ অবনতি ঘটেছিল। সম্পর্কের এ অবনতি বর্তমান বাংলাদেশের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ।

➲ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দক্ষিণ এশিয়াকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও দক্ষিণ এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ শ্রীলংকার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়নি। অথচ ঐতিহাসিকভাবেই দেশটির সাথে আমাদের সম্পর্ক রয়েছে। বেশ কিছু ইস্যুতে বাংলাদেশ শ্রীলংকার অবস্থান এক ও অভিন্ন। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক সহযোগিতা ইত্যাদি নানা ইস্যুতে দু'দেশের অবস্থা এক। তাই দেশটির সাথে সম্পর্কোন্নয়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। তাই এ দেশকে অবজ্ঞা করে বিশ্ব সম্প্রদায়ও ভালাভাবে চলতে পারবে না। কিন্তু বিশ্বদরবার থেকে আমরা যদি আমাদের স্বার্থ আদায় করতে না পারি তবে আমাদের দেশের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ হতে পারে নিম্নরূপ:

- করোনা মহামারি মোকাবিলা বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে বড় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ। আর তাই টিকা প্রাপ্তি এখন একমাত্র পন্থা। কীভাবে বিভিন্ন দেশ হতে টিকা আমদানি করা যায় এবং দেশে কীভাবে টিকা উৎপাদন করা সম্ভব এই বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে হবে। টিকা প্রাপ্তির নিশ্চয়তাকে সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিতে হবে। এজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া বাংলাদেশের প্রধান লক্ষ্য।
- মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলায় জয় লাভের ফলে বাংলাদেশ এখন ব্যাপক সমুদ্র অঞ্চলের মালিক। ফলে সুনীল অর্থনীতি তথা সমুদ্র অর্থনীতির দুয়ার খুলে গেছে। এই বিশাল সম্পদকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় এবং সম্পদ আহরণে কীভাবে দক্ষতা বাড়ানো যায় সেই লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে হবে। এই জাতীয় সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হলে বাংলাদেশ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরো কয়েক ধাপ এগিয়ে যেতে সম্ভব হবে। তাই সমুদ্র অর্থনীতিকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বাংলাদেশকে প্রাকৃতিক সম্পদের দেশও বলা হয়েছে। এদেশে তেল-গ্যাস থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদ কীভাবে উত্তোলন ও ব্যবহার উপযোগী করা যায় সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়নের জন্য ডেল্টা প্লান ২১০০ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এটা একটা বৃহত্তম প্রকল্প, তাই প্রকল্পটি যাতে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সচল থাকতে পারে সেই জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা যাতে এই প্রকল্পকে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে সেই উদ্দেশ্য ও ভাবনাকে মাথায় রেখে অগ্রসর হতে হবে।
- বাংলাদেশ-ভারত তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে অনেক নাটক হয়ে গেল, কিন্তু কোনো সুরাহা মিললো না। তাই বাংলাদেশ চীনের সহযোগিতায় তিস্তা মহাপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে। আর এক্ষেত্রে বড় বাঁধা হয়ে আসবে ভারত। তাই এই পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশকে সতর্কভাবে অগ্রসর হতে হবে। কী ধরনের বাঁধা আসতে পারে তা আগেই পরিকল্পনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বাংলাদেশ সমুদ্র উপকূলের দেশ হওয়ায়, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শিকার দেশে পরিণত হচ্ছে। তাই বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী ধরনের পরিকল্পন গ্রহণ করা প্রয়োজন তা অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে বোর্ড গঠন করে অগ্রসর হতে হবে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলোর দেওয়া ক্ষতিপূরণ অর্থ প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- দ্বিপক্ষীয় চুক্তি বাড়াতে হবে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ভুটানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। ভবিষ্যৎ চীন-ভারতের উপর নির্ভরতা কমিয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ বলা হয় রেমিট্যান্সকে। আর এই রেমিট্যান্স প্রবাহ সচল রাখতে জনশক্তি রপ্তানি বাংলাদেশের জন্য একটি অপরিহার্য কাজ। কিন্তু বৈশ্বিক করোনা মহামারির কারণে বিভিন্ন দেশে জনশক্তি রপ্তানিতে কিছুটা হলেও প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। তাই জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশকে আরো বেশি তৎপর পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।
- আমাদের তিন পাশে ভারত অবস্থিত হলেও তারাও নানাভাবে আমাদের ওপর নির্ভরশীল। কারণ ভারতের চতুর্দিকে রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, চীন, মিয়ানমার। ফলে আমরা যদি অন্য রাষ্ট্রগুলোর মতো ভারত বিদ্বেষী হয়ে উঠি তা কারোর জন্যই ভালো হবে না। তাই ভারতের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে আমাদের স্বার্থগুলো বুঝে নিতে হবে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- বর্তমান বিশ্বে জঙ্গিবাদ একটি ভয়ানক শব্দ। তাই কোনো জঙ্গিবাদী সংগঠন যেন আমাদের দেশে শাখা-উপশাখার মতো প্রভাব বিস্তার না করতে পারে সেই ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে।
- সমুদ্রসীমা যেমন আমরা আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করেছি তেমনি অন্যান্য যে সব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে সেগুলোও আমাদের আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে অর্জন করে আনতে হবে।
- প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে আমাদের দেশের নিরাপত্তা, শান্তি যেন বিঘ্ন ঘটতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থেকে ভবিষ্যতে যেন কোনো অপশক্তি বাংলাদেশে আঘাত হেনে এদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে না পারে সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিশ্বপরিমণ্ডলে অবস্থান সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টার পাশাপাশি এ দেশের ভাবমূর্তি যেন বিশ্বদরবারে উজ্জ্বল হয় সে ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। কারণ মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বদরবার যদি বাংলাদেশকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মূল্যায়ন না করে তবে এই দেশ কোনোদিন উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে পারবে না। ফলে এটিই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

- শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেশ বেশি উন্নত সে দেশ সার্বিকভাবে তত বেশি উন্নত। তাই বলা চলে যে, আমাদের দেশের অনগ্রসরতার সবচেয়ে বড় কারণ শিক্ষা। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটাতে না পারলে এই দেশ কখনও কাম্য মাত্রায় বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শ্রেষ্ঠত্বের ভূমিকায় আসীন হতে পারবে না। এছাড়া আরও একটি সমস্যা হলো শিক্ষাজীবন শেষ করার পর এদেশের অধিকাংশ জনগণকে বেকারত্বের বোঝা বহন করতে হয়। ফলে বেকারত্ব দূর করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এ অভিশপ্ত বেকারত্ব দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।
- বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হয়ে বাংলাদেশ যেমন বিশ্বমানচিত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়েছে ঠিক তেমনি ক্ষুধা, চরম দারিদ্র্য, পুষ্টিহীনতা, নানা প্রকারের রোগব্যাধির কারণে বাংলাদেশ একটি সমস্যার জালে আবদ্ধ রয়েছে। তাই অর্জনের সাথে সাথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূর করে ভবিষ্যতে আরও কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার জন্য করণীয় বিষয়গুলো চিহ্নিত করে সে বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে অনেকদূর এগিয়ে নিতে সরকারের সাথে সাথে সকল বেসরকারি সংস্থা (NGO), পেশাজীবী সর্বোপরি সকল শ্রেণির মানুষকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান মূলনীতিটি বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অতি চমৎকারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি সদ্য জন্ম নেওয়া স্বাধীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে বলেছিলেন যে, “আমাদের দেশটি ক্ষুদ্র, তাই কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়, আমরা চাই সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব।” তাঁর এই উক্তির মধ্যেই আমাদের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য নিহিত। এ ছাড়াও বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্য। তাই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ ও জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মূলনীতিসমূহও মেনে চলে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান দিকগুলো হলো:

সকলের প্রতি বন্ধুত্ব, কারও প্রতি বিদ্বেষ নয়

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে যেহেতু বাংলাদেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল, সেহেতু বাংলাদেশ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে কোনো একটির পক্ষাবলম্বন করে অন্যটির বিরাগভাজন হতে চায় না। এর চেয়েও বড় কথা হলো যে, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হবার পর বাংলাদেশ চায় না যে, সে কোনো বৃহৎ শক্তির গুটি হিসেবে ব্যবহৃত হবে। তাই বাংলাদেশ কোনো নির্দিষ্ট বলয়ে যোগদান করা থেকে বিরত থাকে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

সম্মান প্রদর্শন

বাংলাদেশ অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে। এই মূলনীতিটি জাতিসংঘ সনদের ২(৪) অনুচ্ছেদের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

হস্তক্ষেপ না করা

অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার মূলনীতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ মূলনীতিটিও জাতিসংঘ সনদের ২(৭) অনুচ্ছেদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্ব শান্তি

বাংলাদেশ যে বিশ্ব শান্তি কামনা করে, তা ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে, “আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে দেখতে চাই।” বাংলাদেশ কর্তৃক প্রস্তাবিত শান্তির এই মূলনীতির কয়েকটি তাৎপর্য নিম্নরূপ:

- বাংলাদেশ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস করে।
- বাংলাদেশ যেকোনো বিবাদ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসার পক্ষপাতি এবং
- বাংলাদেশ চায়, যেকোনো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন শান্তিপূর্ণ উপায়ে হবে। এই প্রসঙ্গে এ কথাও সবসময় মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশ কখনও বিশ্বের কোনো রাষ্ট্রের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি প্রদর্শন না করার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি

একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশের পর তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রধানত, তার অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। নয় মাসের যুদ্ধে ব্যাপক ধ্বংস, ক্ষয়ক্ষতি এবং উৎপাদনের কর্মকাণ্ড স্থগিত থাকার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর গভীরভাবে অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত হয়। একই সাথে পরাজিত পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীরা সে সময় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে থাকে। সুতরাং এসব চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে বাংলাদেশ যাতে তার মর্যাদা বজায় রেখে বহির্বিশ্বে একটি মর্যাদাকর ভাবমূর্তি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, সে কথা মাথায় রেখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করা হয়েছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে, যা এখনও অনুসৃত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো এর জাতীয় সম্পদ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা। জাতীয় সম্পদের অনেকগুলো উপাদানের মধ্যে প্রাকৃতিক সম্পদ, খাদ্য ও জ্বালানি উৎপাদন উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের জন্য তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেই সাথে তার সমুদ্রের তলদেশ ও অভ্যন্তরীণ জলসীমার মধ্যে অবস্থিত সম্পদসহ অন্য যেকোনো সম্পদের উপর যেকোনো রকম বৈদেশিক দখলদারিত্বের চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হয়। এভাবে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণেতাদের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব থাকে এর জাতীয় সম্পদগুলোকে সংরক্ষণ এবং সময় ও সুযোগ বুঝে এগুলোকে বৃদ্ধি করার ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালানো।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশ একটি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল রাষ্ট্র, কিন্তু এর মধ্যে যে সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, তা যদি যথাযথ ভাবে কাজে লাগানো যায়, তবে তা অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনতে সক্ষম হবে। বিশেষত বাংলাদেশের যে বিশাল মানব সম্পদ রয়েছে তাদের দক্ষ কর্মী হিসেবে গড়ে তুলে সারা বিশ্বে প্রেরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ লাভবান হতে পারে। আবার সহজ শর্তে বৈদেশিক সাহায্যের ব্যবস্থা করে তা দিয়ে এই বিপুল মানব সম্পদকে দেশেই যথার্থ উন্নয়নের জন্য কাজে লাগিয়ে দেশের উৎপাদন বাড়ানো এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করা সম্ভব। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ও সামনে রাখা হয়।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা

অন্যান্য রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশের জন্যও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার বিষয়টি পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে কাজ করে। কোনো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধান করা বলতে সাধারণত বোঝায় তার সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে নাগরিকদের জান মাল রক্ষা করা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পর বাংলাদেশের নিরাপত্তার প্রতি বহুবার বিভিন্ন দিক থেকে হুমকি এসেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য এমনভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করে যাতে বহির্বিশ্বের কাছে বাংলাদেশ একটি আত্মরক্ষায় সক্ষম সামরিক শক্তিতে বলীয়ান দেশের ভাবমূর্তি অর্জন করতে পারে। এছাড়া প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা ও প্রয়োজনে নিজেদের শক্তির মহড়া দেওয়া পররাষ্ট্রনীতিতে নিরাপত্তার খাতিরেই সংযোজিত হয়।

নিজস্ব মতবাদে দৃঢ় থাকা

বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রই কোনো না কোনো মতবাদ অনুসরণ করে অথবা প্রচলিত যেকোনো মতবাদের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের লক্ষ্য থাকে যেন ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক এ দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের কোনোটিই পুরোপুরিভাবে অনুসরণ না করা হয়। বরং দুইটি পদ্ধতির ভালো দিকগুলো নিয়ে একটি মিশ্র অর্থনীতিকে অনুসরণ করে থাকে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

ভৌগোলিক-কৌশলগত অবস্থান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। দক্ষিণ-পূর্বে মিয়ানমারের সাথে সংকীর্ণ সীমান্ত রয়েছে। বাংলাদেশের তিন দিক ভারত কর্তৃক পরিবেষ্টিত বলে এবং প্রধান প্রধান নদ-নদীগুলো ভারতের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত হবার কারণে ভারতের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও সামরিক কর্তৃত্ববাদ অত্যন্ত প্রকট। এদেশের রাজনীতিতে তাই ভারতবিরোধী ও ভারতঘেঁষা দুটি ধারাই উপস্থিত। এ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরটি পররাষ্ট্রনীতিতে অন্যতম নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে এবং ভারতের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার নীতি অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে উঠে। এছাড়াও বাংলাদেশ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়ার সন্ধিস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়। এ কারণে কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের অনুকূল পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেছে, যার ফলশ্রুতিই হলো SAARC, BIMSTEC এর মত আঞ্চলিক সংস্থা গঠন। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ভূ-ভাগ সন্নিহিত বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের সাথে যুক্ত বলে বাংলাদেশ ভারত মহাসাগরকে সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতামুক্ত রাখতে সচেষ্ট। কৌশলগত বিবেচনায় বাংলাদেশের নিরাপত্তা যেহেতু ভারত মহাসাগরের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের সাথে যুক্ত, সে কারণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সে লক্ষ্যেই প্রণীত হয়েছে। একই সাথে বাংলাদেশ চীন ও এশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে যাতে করে এ দেশটি কিছুটা হলেও স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে পারে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

জনসংখ্যা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা চীন ও ভারতের মতো অধিকও নয়, আবার ভুটান ও মালদ্বীপের মতো কমও নয়। বাংলাদেশ জনসংখ্যাগত বিবেচনায় বিশ্বের মধ্যম পর্যায়ের একটি দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা প্রধানত সমজাতীয়। এ সমজাতীয় জনসংখ্যা বাংলাদেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে এবং বিশ্বে গুরুত্ব বাড়িয়েছে। ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের মতো বাংলাদেশের নিরাপত্তা ভীতি ও অস্তিত্ব সংকট তীব্র হয়ে উঠেনি। তাই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কারো প্রতি নতজানু নয়, নিরাপত্তা ব্যবস্থাও কারো উপর নির্ভরশীল নয়। এছাড়া, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ জনশক্তি হিসেবে আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। এর ফলে পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশও শ্রমশক্তির জন্য বাংলাদেশের উপর নির্ভরশীল। এ কারণে উন্নত দেশের সাথে বাংলাদেশের দরকষাকষির ক্ষমতাও অনেক বেড়েছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জনসংখ্যার গুরুত্ব তাই এতো বেশি।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

জনমত ও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব হচ্ছে, সেই রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে জনমতের প্রতিফলন হতে হবে। বাংলাদেশ ধর্মভীরু মুসলিম জাতিগোষ্ঠীর দেশ। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ইসলামের প্রভাব জনগণের বিশ্বাসেরই প্রতিফলন। ৯১.০৪% জনগণ মুসলিম হবার কারণে এদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করার সময় মুসলিম দেশগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে। ধর্মীয় অনুভূতির কারণেই বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্ব ও ইসলামি উম্মাহর সাথে সম্পর্ক জোরদার করে, OIC ও আরবলীগের দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশ ইতিবাচক সম্পর্ক বজায় রাখে। এছাড়াও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, রাজনৈতিক দল, আমলা ব্যবস্থা, বণিক সমিতি, বেসরকারি সেচ্ছাসেবী সংস্থা ও এনজিও চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে এই গোষ্ঠীগুলোও নিয়ামক শক্তি হিসেবে কাজ করে। কারণ এদের মতামত উপেক্ষা করে কোনো সরকারের পক্ষেই পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব হয় না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

অর্থনৈতিক অগ্রগতি

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল একটি দেশ। এদেশে এখনো ভারী শিল্পের তেমন বিকাশ ঘটেনি, অন্যদিকে কৃষিতে সনাতন প্রযুক্তির উপর নির্ভরতা বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে শিল্প ও কৃষি উভয় ক্ষেত্রে উৎপাদন সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান। এমনকি ভূ-অভ্যন্তরে যে সব প্রাকৃতিক সম্পদের মজুদ আছে তা উত্তোলনের সক্ষমতাও বাংলাদেশের নেই। মূলত পুঁজি গঠনের স্বল্প হার ও আধুনিক প্রযুক্তির অভাবজনিত কারণেই উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে গতিশীল করা যাচ্ছে না। তাই বাংলাদেশকে পুঁজি ও প্রযুক্তির জন্য উন্নত দেশসমূহের উপর নির্ভর করতে হয়। এ কারণে বাংলাদেশ তার পররাষ্ট্রনীতিকে এমনভাবে নির্ধারণ করে যাতে উন্নত বিশ্বের সাথে সু-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঋণ, বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাওয়া যায়। বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি উন্নত হতো তাহলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সাহায্য আদায়মুখী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করতো না।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

রাজনৈতিক নেতৃত্বের মতাদর্শ

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে ও নির্ধারণে রাষ্ট্রশাসকদের আদর্শিক বিশ্বাস ও রাষ্ট্রের মতাদর্শগত পরিবেশ অনেক সময়েই উল্লেখযোগ্য নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী সরকারের উপর ভারতের প্রভাব ছিল। পঁচাত্তর-পূর্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের প্রভাবে বাংলাদেশ ছিল কিছুটা সোভিয়েত ঘেঁষাও। পরবর্তীকালে উদার ও ইসলামি মতাদর্শ অনুসরণের ফলে দেশের সম্পর্ক বেড়েছে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ ও পশ্চিমা বিশ্বের সাথে। সাম্প্রতিককালে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের চরম বিপর্যয় এবং উদার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের ব্যাপক প্রসারের ফলে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে পাশ্চাত্যমুখী ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারক উপাদান

সামরিক সামর্থ্য

জল, স্থল ও আকাশে নিজের আত্মরক্ষার জন্য উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ এবং আধুনিক অস্ত্র সংগ্রহের প্রচেষ্টা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি দেশের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এদিকে বাংলাদেশের চেয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সামরিক ক্ষমতা বহুগুণ বেশি। সেজন্যে বাংলাদেশের মধ্যে সব সময়েই নিরাপত্তা ভীতি বিরাজ করে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ভারতের সাথে সংঘাত এড়িয়ে চলার এবং দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসার ইচ্ছা প্রতিফলিত হয়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের আচরণ ও আন্তর্জাতিক পরিবেশ

বাংলাদেশের প্রতিবেশী হিসেবে বিশেষভাবে ভারতের এবং মিয়ানমারের ও অন্যান্য দক্ষিণ এশীয় দেশের আচরণের উপর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি নির্ভর করে। সীমান্ত সংশ্লিষ্ট বৈরিতা, জনসংখ্যা স্থানান্তর, সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণ, বাণিজ্য ব্যবধান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রতিবেশীদের আচরণের উপর দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ের সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। প্রতিবেশীদের আচরণ সংযত ও বন্ধুত্বপূর্ণ হলে বাংলাদেশও সহযোগিতা সম্প্রসারণে আগ্রহী হয়ে উঠে। তা না হলে জাতিসংঘ ও বিশ্ব-সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতার মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করার নীতি গ্রহণ করতে হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সংকট, বিশেষ করে পারমাণবিক উত্তেজনা বাংলাদেশকে বিচলিত করে। তাই বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে পারমাণবিক প্রতিযোগিতামুক্ত বিশ্ব-পরিবেশ গড়ে তোলার ইচ্ছা বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিফলিত হয়।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

❖ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সুনীল অর্থনীতির গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশ ১ লাখ ১৮ হাজার বর্গকিলোমিটার সমুদ্রের মালিক। আর এই নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ। তেল, গ্যাস, মূল্যবান বালু, ইউরেনিয়াম, মোনাজাইট, জিরকন, শামুক, ঝিনুক, মাছ, অক্টোপাস, হাঙ্গর ইত্যাদি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণিজ ও খনিজসম্পদ রয়েছে সাগরে। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে মৎস্য সম্পদের বিশাল ভাণ্ডার। এখানে প্রায় ৫০০ প্রজাতির মাছ রয়েছে। আরও রয়েছে ২০ প্রজাতির কাঁকড়া, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৩০০ প্রজাতির শামুক-ঝিনুক। এছাড়াও রয়েছে টুনা মাছের মতো দামি ও সুস্বাদু মাছ, যার রয়েছে প্রচুর আন্তর্জাতিক চাহিদা। 'সেভ আওয়ার সি'-এর তথ্যমতে, সমুদ্র থেকে শুধু মাছ রফতানি করে বিলিয়ন বিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করা সম্ভব।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO)-এর মতে, ২০২২ সালের মধ্যে যে চারটি দেশ মৎস্য সম্পদে বিপুল পরিমাণ সাফল্য অর্জন করবে, তার মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। ২০১৭-২০ সালে সারা দেশে মোট উৎপাদিত মাছের মধ্যে সামুদ্রিক মাছ ছিল ৬০ লাখ মেট্রিক টন; যদিও ৮০ লাখ টন মাছ ধরার সুযোগ রয়েছে। ৬০০ কিলোমিটার সমুদ্রসীমার মধ্যে মাছ ধরার সীমানা মাত্র ৩৭০ কিলোমিটার। কিন্তু দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তির অভাবে এ দেশের জেলেরা মাত্র ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত মাছ ধরতে পারে। ফলে বিপুল পরিমাণ মৎস্য সম্পদ থাকার পরও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে যথাযথ পদক্ষেপ নিয়ে বিপুল পরিমাণ সম্পদ কাজে লাগাতে হবে।

সমুদ্রকে ঘিরে বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে। যা দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা, শিল্প উন্নয়ন, টেকসই ও পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জন, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

❖ সমুদ্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের ৯০ ভাগ পরিবহন হয় সমুদ্র পথে। সমুদ্র পথে মালামাল পরিবহনের ফলে আমদানি রপ্তানির খরচ অনেক কমে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। বিশেষজ্ঞদের মতে সুনীল অর্থনীতি কাজে লাগাতে পারলে প্রতি বছর হাজার হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব। তবে দেশে এখন পর্যন্ত সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। গত আট বছরে গভীর-অগভীর সমুদ্রসম্পদ অনাবিষ্কৃত অবস্থায় রয়েছে। অন্যদিকে মিয়ানমার, ভারত সমুদ্রের তেল-গ্যাস উত্তোলন করে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এ দেশে সীমিত পরিসরে তেল-গ্যাস আহরণ শুরু হয়েছে যা বঙ্গোপসাগরে অফুরন্ত তেল-গ্যাস ভাণ্ডারের তুলনায় খুবই স্বল্প। পরিকল্পিতভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ নিতে হবে। এতেই ঘুরে দাঁড়াবে অর্থনীতি।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **শিপিং শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** শিপিং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিভিন্ন উপকূলীয় জাহাজ, লাইটার, ট্যাংকার ইত্যাদির ভাড়া ও পরিবহন ব্যবস্থা থেকে বাংলাদেশের অনেক আয় করার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিলিয়ন ডলার শিল্প হল নৌ-যান নির্মাণ শিল্প। এ সুযোগ লুফে নিয়ে সরকারি বিনিয়োগ বাড়িয়ে দেশীয় জাহাজ বহর সমৃদ্ধ করতে পারলে রাজস্বে মোটা অংকের আয় যুক্ত করা সম্ভব। ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ নীল জলরাশির সম্পদে অগ্রাধিকার দেয়ার কাজ হাতে নেয়া হয়েছে, যাতে গুরুত্ব পাবে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা। এ ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে, পরিকল্পিতভাবে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ করতে হবে, প্রতিবেশী দেশগুলোর সাহায্য নিতে হবে; যদিও ইতোমধ্যে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে, তবে চুক্তি বাস্তবায়নে সরকারকে তৎপর হতে হবে।
- **সমুদ্রবন্দর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** বিশ্ব অর্থনীতিতে সমুদ্রবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সিঙ্গাপুরের প্রধান আয়ের উৎস সমুদ্রবন্দর। বাংলাদেশে ৩টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে যা বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কিন্তু গভীর সমুদ্রবন্দর করার যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেক এগিয়ে যাবে।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা:** জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প দেশের শিল্প উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্প দেশের বাণিজ্য ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সাহায্য করে। সমুদ্র তীরবর্তী দেশ হওয়ায় বাংলাদেশ এ খাত থেকে অনেক লাভবান হতে পারে। উল্লেখ্য, জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পে বিশ্বে বর্তমানে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম।

- **খাদ্যের উৎস হিসেবে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** সমুদ্র বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণের অন্যতম উৎস। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে সমুদ্র থেকে ৬.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করা হয়েছে। ইলিশ মাছ বিশ্বের ৮০% উৎপাদিত হয় বাংলাদেশে। এছাড়াও বিভিন্ন সামুদ্রিক প্রাণী ও কোরাল দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণ ও বিদেশে রপ্তানিতে ভূমিকা রাখে।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনা :** সমুদ্র তলদেশ থেকে আহরিত তেল-গ্যাস বিশ্ব অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে বাংলাদেশে একটি সামুদ্রিক কূপ 'সাঙ্গু" থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। আরও কয়েকটি গ্যাস খনির সন্ধান পাওয়া গেছে, যেমন- কুতুবদিয়া, হাতিয়া, ম্যাগনামা ইত্যাদি। এসব খনি থেকে গ্যাস উত্তোলন খুব শীঘ্র শুরু হবে। আরও তেল-গ্যাস কূপ অনুসন্ধানের জন্য বাপেক্সসহ কয়েকটি বিদেশি কোম্পানি কাজ করে যাচ্ছে। ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের সমুদ্র তলদেশে ২০০ Tcf গ্যাসের মজুদ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সুনীল অর্থনীতিকে কাজে লাগাতে পারলে ১২ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব যদিও আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। বঙ্গোপসাগরে অফুরন্ত তেল ও গ্যাস ভাণ্ডার রয়েছে। যদি বঙ্গোপসাগরের এই সম্পদকে কাজে লাগানো সম্ভব হয় তাহলে বাড়বে রাজস্ব, ঘুরে দাঁড়াবে অর্থনীতি। আর এভাবেই ২০৩০ সালের মধ্যে SDG লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০৪১ অর্জন সম্ভব হবে।
- **লবণ শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব :** লবণের প্রধান উৎস সমুদ্র। বর্তমানে উপকূলবর্তী এলাকা থেকে উৎপাদিত লবণ দ্বারা দেশের চাহিদা পূরণ হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে আরও বেশি লবণ উৎপাদন সম্ভব হলে বিদেশে রপ্তানি করা যাবে।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

- **নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎস হিসেবে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** নবায়নযোগ্য জ্বালানির অন্যতম উৎস সমুদ্র। সমুদ্র বায়ু, স্রোত, ঢেউ ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন করা সম্ভব।
- **পর্যটন ও বিনোদন শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** সমুদ্র দ্বীপ ও সমুদ্র উপকূল পর্যটনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় স্থান। বিশ্বের অনেক দেশ, যেমন: মালদ্বীপ, গ্রীস, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি দেশের আয়ের অন্যতম উৎস পর্যটন শিল্প। বাংলাদেশের কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন, সুন্দরবন, অন্যান্য দ্বীপ ও পার্বত্য অঞ্চল বিশেষ পর্যটন কেন্দ্র হতে পারে। এছাড়া প্রমোদতরী ভ্রমণ ও বিভিন্ন সমুদ্র ভিত্তিক খেলা ও বিনোদন শিল্পকে কাজে লাগিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যেতে পারে।
- **মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা:** সুনীল অর্থনীতি বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নয়টি গবেষণা পরিচালনা করছে। এর মধ্যে সমুদ্র উপকূলে সামুদ্রিক শৈবাল চাষ, শিলা কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও ওয়েস্টার চাষ, হরিণা ও চাকা চিংড়ির চাষ, খাঁচায় ভেটকি ও মুলেটের চাষ, গ্রিন মাসলের চাষ ইত্যাদি অন্যতম। কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে এ পর্যন্ত ১৩৮ প্রজাতির সামুদ্রিক শৈবাল শনাক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৮ প্রজাতির শৈবাল বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানিযোগ্য ও লাভজনক।

বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয় (সুনীল অর্থনীতি)

➲ **টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব ও সম্ভাবনা :** ব্লু ইকোনমি বাংলাদেশের মতো সমুদ্রভিত্তিক দেশের টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি। টেকসই উন্নয়ন হলো এমন উন্নয়ন যা ভবিষ্যতের প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের ক্ষমতাকে আপস না করে বর্তমানের চাহিদা পূরণ করে। টেকসই অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য নীল অর্থনীতি হলো সমুদ্র এবং তার সংস্থানসমূহের ব্যবহার এবং ধারণাটি বাংলাদেশ এবং দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন। দেশের স্থলভাগে যে পরিমাণ সম্পদ আছে তার প্রায় সমপরিমাণ (৮১ শতাংশ) সম্পদ সমুদ্রের তলদেশে রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশে যে সম্পদ রয়েছে তা টেকসই উন্নয়নের জন্য সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। তেল-গ্যাসসহ অন্যান্য মূল্যবান সম্পদ উত্তোলন, মৎস্যসম্পদ আহরণ, বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও পর্যটনের ক্ষেত্রে পরিকল্পনামাফিক কার্যক্রম পরিচালনা করা গেলে ২০৩০ সাল নাগাদ প্রতিবছর আড়াই লাখ কোটি ডলার আয় করা সম্ভব। অপার সম্ভাবনাময় এ খাতকে কাজে লাগানো জরুরি। সমুদ্রের তলদেশে কী ধরনের সম্পদ রয়েছে, সেগুলো আহরণ করতে হলে কোন ধরনের প্রযুক্তি ও বিশেষজ্ঞ জনবল প্রয়োজন তা পরিকল্পনা মাফিক নির্ধারণ করে সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সুনীল অর্থনীতির ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশ। দেশের স্থলভাগের প্রায় সমপরিমাণ সমুদ্রসীমায় এখন মূল্যবান সম্পদের ভাণ্ডার। ভারত ও মিয়ানমার থেকে অর্জিত সমুদ্রসীমায় ২৬টি ব্লক রয়েছে। ইজারা দিয়ে এসব ব্লক থেকে প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস পাওয়া সম্ভব মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। এছাড়া নীল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বিচিত্র সামুদ্রিক সম্পদ।

LDC

ভূমিকা

উন্নয়নশীল বিশ্বে বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য ECOSOC ১৯৬৪ সালে UNCTAD গঠন করে। ১৯৬৪ সালেই UNCTAD আবার G-77 গ্রুপ গঠন করে যার সদস্যগুলো মূলত উন্নয়নশীল ৭৭টি দেশ। ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ G-77 ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্যে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোকে LDC তালিকাভুক্ত করে। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ LDC ভুক্ত হয়।

LDC থেকে উত্তরণ

১৬ মার্চ, ২০১৮ সালে CDP তাদের ২০তম সভায় ঘোষণা করে যে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশকে এর চূড়ান্ত ঘোষণা পেতে হলে ২০২৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে এবং পরপর ৩ ধাপে উত্তরণের শর্ত গুলো ধরে রাখতে হবে।

LDC

LDC থেকে উত্তরণের শর্ত:

সূচক/LDC থেকে মুক্ত হওয়ার শর্ত	CDP শর্ত	বাংলাদেশের অর্জন	
		২০১৮	২০২১
গড় মাথাপিছু আয় (GNI)	১২৩০ ডলারের বেশি (২০২১ সালে নতুন মানদণ্ড ১২২২ ডলারের বেশি)	১২৭৪ ডলার	১৮২৭ ডলার
মানব সম্পদ সূচক (HAI)	৬৬ বা তার বেশি	৭৫.২	৭৫.৩
অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (EVI)	৩২ বা তার কম	২৫.২	২৭.২

বাংলাদেশ LDC থেকে উত্তরণের প্রথমবার শর্ত পূরণ করে ২০১৮ সালে। জাতিসংঘের CDP ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারণ করে যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় বারের মতো স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) বিভাগ থেকে স্নাতক হওয়ার জন্য ৩টি প্রয়োজনীয় শর্ত আবারো পূরণ করতে সমর্থ হয়েছে। একটি দেশকে LDC উত্তরণের জন্য পরপর ৩বার শর্ত পূরণের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হবে। বাংলাদেশ ২০১৮, ২০২১ পরপর দুইবার সক্ষম হয়েছে। ২০২৪ সালে ৩য় বার সফল হতে হবে। যার ফলে ২০২৬ সালে চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে এবং ২০২৭ সাল থেকে LDC ভুক্ত দেশের সকল সুবিধা বাংলাদেশ হারাবে।

তিনটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের শক্তিশালী পারফরম্যান্স তার অর্থনৈতিক শক্তি ও স্থিতিস্থাপকতা প্রদর্শন করে। এমনকি COVID-19 মহামারির সময়েও বাংলাদেশ সবগুলো শর্ত পূরণে সক্ষম ছিল। ফলস্বরূপ, দেশটি ২০২৬ সালের নভেম্বরে LDC মর্যাদা থেকে উন্নয়নশীল দেশ হতে চলেছে।

LDC

চ্যালেঞ্জ সমূহ

নভেম্বর, ২০২৬ বাংলাদেশ LDC থেকে মুক্ত হয়ে উন্নয়নশীল দেশে পদার্পন করলে অনেকগুলো সুবিধা হারাবে এবং কিছু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হবে —

ক. GSP সুবিধা, কোটা সুবিধা ও শুল্ক সুবিধা হারানোর ফলে বাংলাদেশ তার বার্ষিক রপ্তানি আয়ের ১৪% বা ৫.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারাতে পারে।

খ. পোশাক খাতের বাজার একসেস (Access) হারানোর ফলে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। ধারণা করা হচ্ছে পোশাক রপ্তানি ৮-১০% কমে যাবে।

গ. LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ আর বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অধীনে LDC নির্দিষ্ট বিশেষ সুবিধাগুলো বা ডিফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্টের জন্য যোগ্য হবে না।

ঘ. ২০২৭ সাল থেকে বাংলাদেশে আর Soft Loan বা স্বল্প সুদের ঋণ পাওয়ার যোগ্য হবে না। ঋণের জন্য বাংলাদেশকে কমপক্ষে ২.২৬% সুদে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

LDC

ঙ. বাংলাদেশ Green Climate Fund এর মতো বিশেষ তহবিল হতে অর্থ পাবে না। ফলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান বিপদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্থিতিস্থাপকতা কমে যাবে। যেহেতু বাংলাদেশ জলবায়ু বিপর্যয়ের দ্বারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, সুতরাং GCF হারানো একটি বড় ধাক্কা হতে পারে।

চ. জাতিসংঘের প্রযুক্তি ব্যাংক স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে টেকসই উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি খাতে সহায়তা দিয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে তারা বাংলাদেশকে আর সহায়তা করবে না।

ছ. স্বল্পোন্নত দেশ হিসাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাঁদার পরিমাণ খুবই কম কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের ক্যাটাগরিতে চলে গেলে বাংলাদেশের প্রদেয় চাঁদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

LDC

LDC থেকে উত্তরণের সুবিধা

LDC থেকে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি কিছু সুবিধাও পাবে—

ক. আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে দেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পাবে। ফলস্বরুপ, দেশের ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা ইতিবাচক সংকেত পাবে এবং সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) বৃদ্ধি পাবে।

খ. সুদের হার বাড়লেও উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বৈদেশিক ঋণ পাওয়া সহজ হবে এবং ব্যবসায়ীদের LC (Letter of Credit) নিশ্চিতকরণের খরচ বিদেশি ব্যাংকগুলি কমিয়ে দেবে।

গ. বিনিয়োগ বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। সরকারের ভ্যাট, ট্যাক্স এবং রাজস্ব আদায়ও বাড়বে।

LDC

সম্ভাব্য সমাধান/সুপারিশ সমূহ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলা করার জন্য যে সুপারিশগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে—

ক. আমাদের কর জিডিপি অনুপাত ৭.৫ শতাংশ যা এখনও তুলনামূলকভাবে কম। প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কর সংগ্রহকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।

খ. মানি লন্ডারিং করে দেশের অর্থ বিদেশে পাচার করা হচ্ছে। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে মানি লন্ডারিং বন্ধ করা হয়েছে এবং এর জন্য দায়ীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে।

গ. GSP সুবিধা হারানোর বিপরীতে FTA, PTA, MFN (Most favored Nation), GSP Plus সুবিধা ইত্যাদি গ্রহণ করা যেতে পারে।

ঘ. FDI বাড়ানোর জন্য কূটনৈতিক মিশনগুলোকে প্রতিটি দেশে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে তুলে ধরতে হবে।

ঙ. যেহেতু বাংলাদেশ Copy right সুবিধা হারাবে সেহেতু Digital Economy, উদ্ভাবনী শক্তি বৃদ্ধি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

LDC

চ. বাংলাদেশের ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে ভারত, চীন, জাপান ও কোরিয়ার পাশাপাশি অন্যান্য দেশগুলোকেও বিনিয়োগে আকৃষ্ট করা যেতে পারে।

ছ. বাংলাদেশ ২০১২ সালে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এ প্রবেশ করেছে যা ২০৪০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে বাংলাদেশ তার জনশক্তিকে সর্বোচ্চ কাজে লাগাতে পারে।

পরিশেষে বলা যায়, উন্নয়নশীল দেশে পদার্পণের ফলে বাংলাদেশ অনেক প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দিয়ে যাবে। আর এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকতে হলে বাংলাদেশকে প্রতিটি সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। UNCTAD এর সর্বশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে স্বচ্ছতার মাধ্যমে ৮০% বাণিজ্য সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আন্তর্জাতিক মানের পোশাক রপ্তানির মাধ্যমে বাংলাদেশ তার বিদেশি ক্রেতা ধরে রাখতে পারে এবং উন্নয়নশীল দেশের পথযাত্রায় এগিয়ে যেতে পারে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশকে কী কী করতে হবে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলভিত্তি কী? আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কী ভূমিকা পালন করতে পারে? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- রোহিঙ্গা ইস্যুকে আপনি কী 'জাতীয় নিরাপত্তার সংকট' না 'মানবতার সংকট' হিসেবে বিবেচনা করেন? আপনার বিবেচনায় এ সংকট মোকাবিলা করার কৌশল ও পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- দক্ষিণ এশিয়ার পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম দুইটি দেশের নাম কী? স্বীকৃতি প্রদানের তারিখ কত? [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়